ম্যাকসিম গর্কি

জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

সোভিয়েত সমীক্ষা
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, ৬ এপ্রিল ১৯৬৮

সম্পাদক : জি. এল. কোলোকোলোফ
ব্যবস্থাপনা-সম্পাদক : এল. এস. কুরিলোফ
যুগ্ম-সম্পাদক : প্রদ্যোৎ গুহ

দাম : দশ পয়সা

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানের বার্তা বিভাগের পক্ষে
ভি গুর্গেনোফ কর্তৃক ১/১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক কালান্তর প্রেস, পি-৪৩ ডাঃ সুন্দরীমোহন
এভিনিউ, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

মহান প্রলেতারিয় লেখক—ম্যাকসিম গর্কি ৫
নাদেঝদা শের

লেনিন ও গর্কি ১৫
অধ্যাপক এ. মিয়াজনিকোভ

গর্কির সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ ৩৩
য়েভগেনি কৃনিপোভিচ্

ম্যাকসিম গর্কি ৪০
আনাতোলি লুনাচারস্কি

ম্যাকসিম গর্কি ও ভারত ৪৭
পিয়তর বারান্নিকোভ

ভারতে গর্কির 'মা' ৫৫
বীরেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতীয় লেখকদের আলোচনাচক্রে
শ্রদ্ধা নিবেদন ৬০

ড° মুলক্ রাজ আনন্দের ভাষণ ৬৯

কলকাতায় গর্কি জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ৭৫

SOVIET SAMIKSHA

Vol. 3, No. 16, April 6, 1968

MAXIM GORKY CENTENARY ISSUE

Contents

Maxim Gorky—Great Proletarian Writer
by Nadezhda Sher

Lenin and Gorky
by Prof. A. Myasnikov

Gorky's Socialist Humanism
by Yevgeni Knipovich

Maxim Gorky
by A. Lunacharsky

Maxim Gorky and India
by Pyotr Barannikov

Gorky's Mother in India
by Virendra Tripathi

Symposium of Indian Writers Salutes
the Memory of Maxim Gorky

Speech by Dr. Mulk Raj Anand

Calcutta Celebrates Gorky Centenary

মহান প্রলেতারিয় লেখক—ম্যাকসিম গর্কি

নাদেঝদা শের

১৮৬৮ সালের ১৬ মার্চ (নতুন ক্যালেণ্ডারের ২৮ মার্চ) নিঝনি নভগোরোদ শহরে জন্মগ্রহণ করে আলিওশা—আজকের গর্কি। মাতা ভারভারা এবং পিতা ম্যাকসিম পেশকোভ।

ছুতোর ম্যাকসিম ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সদয় এবং সর্বদাই হাসিখুশি। ভারভারা তাঁর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ম্যাকসিমকে বিয়ে করে।

শ্বশুরের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা ম্যাকসিমের ছিল না। আলিওশা তিন মাসে পড়তেই বৌ-ছেলেকে নিয়ে ম্যাকসিক আস্ত্রাখান শহরে গিয়ে ডেরা বাঁধল। কাজও একটা জুটিয়ে নিল। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই কলেরায় মারা গেল ম্যাকসিম। ভারভারা ছেলের হাত ধরে ফিরে এল বাপের বাড়ি।

কিন্তু বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকা ভারভারার কপালে জুটল না। ঠাকুমার হেফাজতে ছেলেকে রেখে ভারভারা কিছুদিনের মধ্যেই বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

ঠাকুমা আকুলিনা—এমন নারী-চরিত্র সচরাচর চোখে পড়ে না। মনটি ছিল অসম্ভব নরম। পরবর্তীকালে এই ঠাকুমার কথা বলতে গিয়ে গর্কি বলেছেন মনে হয় ওঁর ভিতর থেকে 'অন্তরের আলো বের হত'। আকুলিনা পরিবারের অন্যান্যদের মত একেবারে নন। সকলের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব মমতা এবং যখনই সম্ভব হত তিনি তাদের পক্ষে দাঁড়াতেন।

মানুষটি ছোট্ট হলেও শরীরের গড়ন ছিল ভরাট। হালকা দ্রুত পায়ে এ-ঘর ও-ঘর করতেন। কথাবার্তায় ছিলেন প্রাণোচ্ছল—কড়া কথা বলতেন না। নাতি আলিওশাকে যখন গল্প বলতেন গলায় যেন তখন সুর খেলত। গল্প তখন উজ্জ্বল, রঙীন হয়ে দেখা দিত সেই কনিষ্ঠ শ্রোতার শ্রবণে। মাঝে মাঝে নাতিকে ঠাকুমা ঠাকুর্দার গল্প শোনাত, কখন কখন

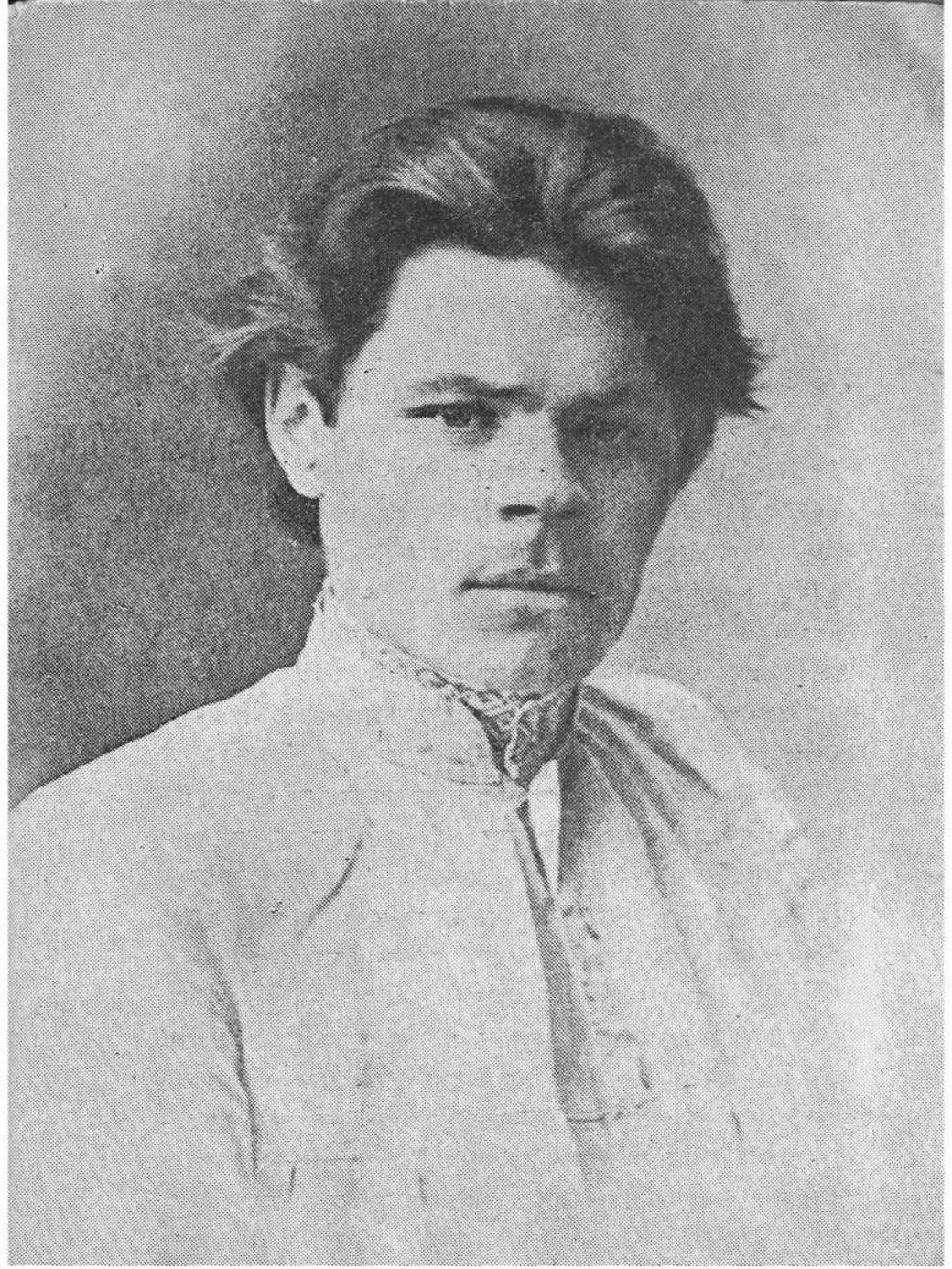

এ. এম. গর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)
১৮৯২ সালে নিঝনি নভগোরোদে তোলা আলোকচিত্র

বাপের গল্পও। কাশিরিন পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি ম্যাকসিমকে পছন্দ করতেন। ঠাকুর্দা ছিল রোগা ছোটো-খাটো দেখতে, লাল রঙের দাড়ি, টিয়াপাখির মত ঠোঁট, সবজে রঙের ছোট ছোট চোখ; আলিওশা নিজের ঠাকুর্দাকে বিশেষ পছন্দ করত না।

বছর দুয়েক লেখাপড়া করার পরেই আলিওশাকে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতে হল। হঠাৎ মা মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ঠাকুর্দা তাকে ডেকে বলল: "দেখ, তুমি এমন একটা কিছু সোনার টুকরো ছেলে নও যে তোমায় গলায় ঝুলিয়ে রাখব। এবার বাপু কাজকম্ম দেখ।"

১৮৭৯ সালের শরৎকাল। আলিওশা অসুস্থ ছিল, সেই অবস্থায়ই ঠাকুর্দা তাকে এক নামকরা জুতোর দোকানে সাকরেদির কাজে ভিড়িয়ে দিল। নতুন চাকরির জায়গায় আলিওশাকেই সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতে হত। তারপর সমস্ত জুতোগুলো সাফ করে, কাপড়জামা বুরুশ করে তাকে চা তৈরি করতে হত। উনুনের কাঠ এনে দোকানঘর ঝাঁট দিয়ে তারপর সে খদ্দেরদের জুতো বেচত।

কয়েক মাস এই হাড়ভাঙা খাটুনির পর আলিওশা একদিন মতলব করল, পালাবে। কিন্তু যেদিন তার কেটে-পড়ার কথা, সেইদিনই এক দুর্ঘটনা ঘটল। বাঁধাকপির গরম স্যুপে হাত পুড়িয়ে আলিওশাকে যেতে হল হাসপাতালে। সারা রাত হাসপাতালে সে যন্ত্রণা ও ভয়ে কেবল কাঁদল, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভেঙেই আলিওশা দেখে তার বিছানার পাশে বসে আছে স্বয়ং ঠাকুর্দা। আলিওশা ভাবল স্বপ্ন দেখছে। কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার এসে আলিওশার হাতে পট্টি বেঁধে দিয়ে গেল—আলিওশা এবার বাড়ি যেতে পারে।

বাড়িতে এসে দেখল সবই ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু আলেকসেই এখন অন্য এক মানুষ। সে বুঝতে পারছে সামনে কঠিন দিন, বুঝতে পারছে জীবন কী কঠিন রূঢ়তা ও অপমানে পূর্ণ।

শরৎকাল এল। আলেকসেইকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সারগেয়েভদের ওখানে হাড়ভাঙা খাটুনির কাজে। ঠাকুমার কীরকম যেন আত্মীয় হতেন তাঁরা।

ঠাকুমার এক বোনপো ছিল ড্রাফটস্‌ম্যান। কথা ছিল আলিওশাকে

সে ড্রাফটস্‌ম্যানের কাজ শেখাবে। কিন্তু তার বদলে সে তাকে দিয়ে যত রাজ্যের খাটুনির কাজ করিয়ে নিত। পরিশ্রমী ছেলে আলেকসেই বাড়িঘর সবসময়ে ঝকঝকে তকতকে করে রাখত কিন্তু তাকে ড্রাফটস্‌-ম্যানের কাজ শেখান হচ্ছে না এতে সে ভয়ংকর কষ্ট পেত।

শেষপর্যন্ত একদিন আলেকসেইর মনে হল আর পারছে না। অবশেষে পিটটান দিল সে ও-বাড়ি থেকে। সময়টা ছিল বসন্তকাল। হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে আলিওশা দেখল সে ভোলগার বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভোলগার পারে স্টিমারের মাল-খালাসীদের সঙ্গে কিছুদিন কাটল। শেষে একদিন খবর পেল দ্রোব্রেই স্টিমারে রান্নাঘরে বাসন-বওয়ার কাজে একটা লোক চাই। রাঁধুনীর কাছে চাকরির জন্য এসে দাঁড়াল আলিওশা।

রাঁধুনীর নাম মিখাইল সুমরিই। প্রথম দিনই আলিওশাকে তার কেবিনে ডেকে একটা বই হাতে দিয়ে পড়ে শোনাতে বলল। বইটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না আলিওশা, পড়তেও ভাল লাগল না। কয়েক দিন বাদে ক্যাপটেনের বউ সুমরিইকে গোগোলের এক খণ্ড রচনা দিল। আলিওশা গোগলের প্রথম গল্প পড়ল 'ভয়ংকর প্রতিহিংসা।' এর পরে পড়ল 'তারাস বুলবা'—গল্প পড়ে সুমরিই এবং বালক আলিওশা উভয়েই মুগ্ধ।

সারাদিন কাজ করতে হত আলিওশাকে। ভোর ছ'টা থেকে রাত পর্যন্ত বাসন ধোয়া, ছুরি-কাঁটা মোছা, রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজ করতে হত। কাজের মাঝে সময় পেলেই রাঁধুনীকে বই পড়ে শোনাতে হত।

শরৎকাল ফিরে এল। আলিওশা বাড়ি গেল। গিয়ে দেখল ঠাকুর্দা আকণ্ঠ দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে তার লোভ। দেখল ঠাকুমা বুড়ি হয়ে গেছে। ঘর ছেড়ে আবার সে পথে নামল। এখানে ওখানে বিচিত্র ধরনের চাকরি করে, বহুতর বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে দিন কাটতে লাগল।

একদিন আলিওশা পুশকিনের একখানি কবিতার বই হাতে পেল।

গর্কি লিখেছেন: "এক নিঃশ্বাসে বইটা পড়ে ফেললাম। পুশকিন আমার কানে কবিতার সারল্য ও সুরকে এমনভাবে বাজিয়ে গেলেন যে পরে বহুদিন পর্যন্ত গদ্য আমার কানে ভীষণ অস্বাভাবিক বলে ঠেকত···

গদ্য পড়তেই পারতাম না···। পুশকিনের কবিতার সুর আমার স্মৃতিতে সবকিছুকেই যেন আনন্দময় করে তুলল। আমি খুসী হলাম! কবিতার লাইনগুলি আমার কাছে মনে হল যেন নতুন যুগের অগ্রদূত। লেখাপড়া শেখায় কত সুখ! বার বার পড়ার পর ভাল করে পুশকিনের গল্পগুলি বুঝলাম—আমার মুখস্ত হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ফিসফিস করে আওড়াতাম কবিতার লাইনগুলো। তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।"

তাঁর মনিব প্রায়ই বই কেড়ে নিয়ে তাকে পড়ার জন্য শাস্তি দিত।

বহু বছর পরে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "সেদিন আমার মনে পড়ে, সেই পড়ার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার জন্য কত অপমান ও বেদনা যে আমায় সহ্য করতে হয়েছে তা ভাবলে আজও কষ্ট হয়।"

পুশকিন, লারমেনতোভ, গোগোল প্রভৃতি মহান রুশ সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলেকসেই পেশকোভের পরিচয়ের সূত্রপাত এইভাবেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বই ছিল তাঁর বিশ্বস্ত সহচর।

"বই আমার মন আর হৃদয়কে উড়তে শেখাল, আমাকে পাঁক থেকে টেনে তুলল···যে-পাঁকের মধ্যে বোকামি আর অশ্লীলতা আমায় টেনে নামাচ্ছিল···। বই আমার চোখের সামনে তুলে ধরল বিপুল এক পৃথিবী, শেখাল জীবনকে উন্নত করার সংগ্রামে রত মানুষ কী মহান, জীবনে সীমাহীন দুঃখকষ্ট সহ্য করেও পৃথিবীকে নতুন করে সাজানোর জন্য মানুষের কী বিরাট প্রয়াস। আমার মনে মানুষের জন্য ভাবনা এবং তার অশান্ত আত্মার জন্য ভালবাসা জাগিয়ে দিল বই।"

১৮৮৪ সালের শরৎকালে একদিন আলেকসেই পেশকোভের পরিচিত একটি ছাত্র তাকে নিয়ে গেল আন্দ্রেই দেরেনকোভের কাছে। দেরেনকোভের ছোট্ট একটা মুদি-দোকান ছিল। কেউ জানত না এমনকি পুলিশ পর্যন্ত জানত না যে সেই দোকানের উপরে দেরেনকোভের ঘরে নিয়মিত তরুণ বিপ্লবীদের বৈঠক হত। কেউ জানত না তার ঘরে লুকোন তাকে ভর্তি ছিল নিষিদ্ধ বই।

দেশের ভবিষ্যৎ এবং রুশ জনগণের ভাগ্য নিয়ে আলিওশার এই নতুন বন্ধুদের ছিল গভীর ভাবনা। তারা যখন কথা বলত, আলিওশার মনে হত ওরা যেন তার নিজের কথাই বলছে। সে ওদের পাঠচক্রগুলিতে

যোগ দিত ; কিন্তু এই পাঠচক্রগুলিকে অত্যন্ত নীরস মনে হত। একসময় তার মনে হল ওদের চেয়ে জীবন সম্পর্কে তার নিজের জ্ঞান অনেক বেশি এবং ওরা যা বলত তার অনেক কিছুই পড়া হয়ে গেছে, অনেক কিছুই সে দেখেছে।

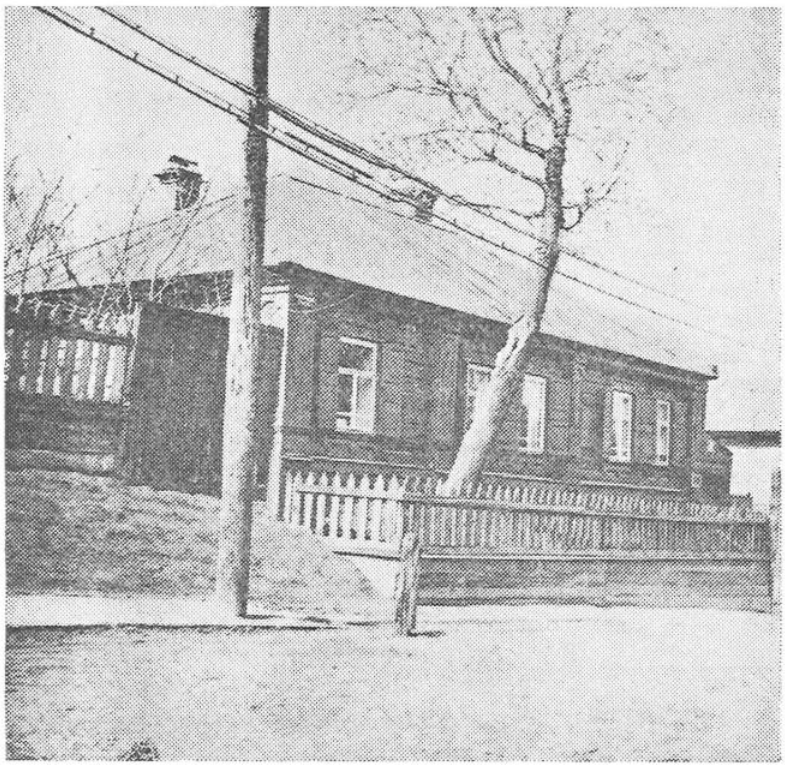

নিঝ্‌নি-নভগোরোদে কাশিরিনের বাড়ি

দেরেনকোভের সঙ্গে পরিচয়ের পর পেশকোভ চাকরি পেল সেমেনোভের রুটির কারখানায়। দোকানটা ছিল একটা সেলারের মধ্যে। এমন অসহনীয় অবস্থায় ওকে আর কোথাও চাকরি করতে হয় নি। ভ্যাপসা গরম আর জঘন্য নোংরা পরিবেশে দিনে ১৪ ঘণ্টা খাটতে হত। কারখানার উপরে, বাড়ির অন্যান্য তলায় যারা বাস করত, সুযোগ পেলেই

আলিওশা তাদের নিষিদ্ধ বই পড়ে শোনাত। উন্নততর জীবনের জন্য ওদের মনে আশা জাগাবার উদ্দেশে আলিওশা আকুল হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, "মাঝে মাঝে মনে হত আমি সফল হয়েছি। যখন দেখতাম ওদের মুখগুলো মানবিক বেদনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, চোখে রাগের আগুন ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে, আমার তখন মহা আনন্দ হত। আমি এইসব মানুষের মধ্যে কাজ করছি এবং তাদের মনে আলো এনে দিচ্ছি, এই গর্বে মন ভরে উঠত।"

দেরেনকোভ যখন একটা রুটির কারখানা খুলল, তখন আলিওশা সেমেনোভের কাজ ছেড়ে ওখানে গিয়ে ঢুকল। রুটির কারখানা থেকে যা লাভ হত তা বিপ্লবের কাজে খরচ করা হত। আলেকসেই পেশকোভ এখানে সারাদিন খাটত। রুটির ময়দা মাখত, রুটিগুলো উনুনে সারি সারি করে সাজিয়ে দিত, টাটকা রুটি ঝুড়িতে করে উনুন থেকে তুলে আনত। ভোরবেলা সেই রুটির ঝুড়ি নিয়ে আলিওশা বেরিয়ে পড়ত ছাত্রদের খাবার ঘরে আর অন্যান্য খদ্দেরদের বাড়িতে বাড়িতে রুটি বিলি করতে। রুটির নিচে লুকিয়ে রাখত বই, পুস্তিকা আর ইস্তাহার। সেগুলো নির্দিষ্ট ঠিকানায় বিলি করাও ছিল তার কাজ।

বই ছিল আলিওশার জীবনের সহচর। পুশকিন আর লেরমোনতোভের রচনা যে-আনন্দে তার হৃদয় একদিন জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সারা জীবন ধরে সেই আনন্দ তার বেঁচেছিল। এ ছাড়া ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প আর গান তার মনের কোথায় যেন একটা কোমল জায়গা অনেকখানি দখল নিয়ে বসেছিল।

বইয়ে-পড়া নায়কের মত হব—এ ছিল আলিওশার স্বপ্ন। বাস্তব জীবনে একদিন সেই নায়কের দেখা সে পাবে এ স্থির বিশ্বাস ছিল তার। সরল, প্রাজ্ঞ সেই নায়কই তাকে জীবনে সত্যের পথের সন্ধান দেবে। "সে পথ হবে তলোয়ারের ফলার মতই কঠিন এবং সোজা।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। "ভ্রাম্যমান জীবনই" ছিল তাঁর প্রকৃত "বিশ্ববিদ্যালয়"। কাছে থেকে মানুষকে জানা, বিপ্লবী তরুণদের পাঠচক্রে যোগ দেওয়া, মানুষের জন্য ভাবনা, মানুষের উপর বিশ্বাস এসবই ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয়।

'আমার বিশ্ববিদ্যালয়'—আত্মজীবনীমূলক এই বইতে পরে তিনি এই-সব দিনের গল্পই বলেছেন।

অত্যন্ত অল্প বয়সে আলিওশা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম রচনা "পুরনো ওকের গান" গদ্যে ও পদ্যে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ভ্লাদিমির কোরোলেঙ্কোকে রচনাটি তাঁর দেখাবার ভীষণ ইচ্ছা ছিল। কোরোলেঙ্কো তখন নিঝনি-নভগোরদে বাস করছিলেন। একদিন গিয়ে তাঁর কাছে লেখাটি রেখে এলেন।

দিন পনের বাদে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরৎ এল, সঙ্গে একটি ছোট্ট চিরকুট তাতে লেখা, "এই 'গান' থেকে তোমার ক্ষমতার বিচার করা কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার মধ্যে কিছু আছে। যে-জীবনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছ সেই জীবন সম্পর্কে কিছু লিখে আমাকে দেখিও। আমি কবিতার বিচারক নই। তোমার পদ্য আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, কিন্তু তবু তার মধ্যে এমন কিছু লাইনও আছে যেগুলি স্পষ্ট এবং মর্মস্পর্শী।"

তরুণ গর্কি পাণ্ডুলিপিটি ছিঁড়ে তখুনি উনুনে গুঁজে দিলেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন "যে-জীবনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছ" কথাটার মানে কি? তাঁর অভিজ্ঞতাই তো ঐ কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে, তবে? সেই কবিতাগুলির মধ্যে একটি লাইন ছিল "আমি এ পৃথিবীতে এসেছি সবকিছু মাথা পেতে না মেনে নেওয়ার জন্য।" পরবর্তীকালে তিনি কবিতাগুলির মধ্যে ঐ একটা লাইনই মনে করতে পেরেছিলেন।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক তিনি স্থির করলেন লেখা ছেড়ে দেবেন!

গ্রীষ্মের এক রাতে তিনি ভোলগার পারে একা বসেছিলেন। হঠাৎ একজন এসে তাঁর পাশে বসল; তিনি কোরোলেঙ্কো।

"ভাবনায় ডুবে গেছ দেখছি। ভেবেছিলাম তোমার টুপিটা চুপিসাড়ে তুলে নেব। তারপর মনে হল তাতে হয়তো তুমি হঠাৎ চমকে যেতে পার।"

শুরু হল আলাপ। আলেকসেই পেশকোভ তাঁর মনের কথা উজাড় করে দিলেন। যে-ভাবনা তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে সে সবই বললেন। নিঃশব্দে মাথা নিচু করে, সব শোনার পর কোরোলেঙ্কো বললেন:

"যা বললে তার অধিকাংশই সত্যি। দেখার চোখ তোমার আছে।··· কিছু লিখছো কি?

"না, লিখছি না।"

"শুনে দুঃখিত হলাম। আমার মনে হয় তোমার লেখা উচিৎ। তোমার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে—এই আমার ধারণা···তোমার মনের কাঠামোটার সঙ্গে কেবল আমার সব জায়গায় মতের মিল নেই।"

কয়েক মাস পরে ১৮৯১ সালের বসন্তে একদিন আলেকসেই নিঝনি নভগোরদ ছেড়ে গেলেন। শুরু হল তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা।

পথঘাট তখনও শুকোয় নি। মাঠের বরফ তখন গলে শেষ হয়ে যায় নি। মাঝে মাঝে বসন্তের ঘাস মাথা তুলেছে। ঝোলা কাঁধে নিয়ে ভোলগার পার থেকে জারিৎসিনের উদ্দেশ্যে স্টিমারে উঠল আরেকসি। জারিৎসিনের আজকের নাম ভোলগোগ্রাদ। ভোলগর দুই তারের জীবনের ছবি তাঁর মনের গুমোট ভাব দূর করে দিল।

জারিৎসিনে নেমে নীল নয়ন সেই স্বপ্নাবিষ্ট কবি, বুকে দুঃসাহসী আশা, দক্ষিণের পথ ধরে চলল। দন অঞ্চল, উক্রাইন, বেসারাবিয়া, ক্রিমিয়া ছাড়িয়ে পৌঁছন ককেশাসে। রুশিয়াকে জানা, রুশিয়ার মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন—এই ছিল তাঁর কামনা। মানুষ, সমুদ্র, জাহাজ, পাহাড় আর বিশাল প্রান্তর আর ফুল দেখতে দেখতে হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে বেড়ালেন। সবসময়েই তাঁর ঝোলার মধ্যে থাকত বই, তার মধ্যে কিছু কবিতার বই।

শরৎকালে তিনি এসে পৌঁছলেন তিফলিসে—যার বর্তমান নাম ত্বিবিলিসি। এইখানেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প। তিফলিসে কিছু নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়—কিছুদিন রাজনৈতিক প্রচারের কাজেও ব্যস্ত থাকেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আলেকজান্দার কালিউঝনির। এই বিপ্লবী তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

ছ বছর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ভোগের পর কালিউঝনি ট্রান্সককেশিয় রেলওয়েতে কাজ করছেন। রেলওয়েতে পেশকোভের একটা চাকরি জুটে যায়। প্রথমে রেলের ওয়ার্কশপে হাতুড়ি চালানোর কাজ শেষে উন্নতি হল মাস্টারের পদে।

একটা বাড়ির নিচের তলায় এক ঘরে কয়েকজন বন্ধুকে জুটিয়ে পেশকোভ একটা কমিউন মত গড়ে তুললেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় এখানে আলোচনা ও বই পড়া হত। ফ্যাক্টরির শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী,

ছাত্র প্রভৃতি অনেকে এতে যোগ দিত। কারখানায় কাজ আর যৌথ জীবন তাঁকে অনেক কিছু শেখাল।

সদ্যকারামুক্ত প্লাতেনেভকে তিনি লিখছেন, "গতকাল আমাদের ঘর তল্লাসি হয়ে গেছে। একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে আমি বই পড়ছি। আমি তাদের কিছু শেখাচ্ছি না কেবল তাদের পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করছি। রেলওয়ে শপের শ্রমিকদেরও বই পড়ে শোনাই, তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। বোগাতিরোভিচ্ নামে একটি শ্রমিক আছে, লোকটা চমৎকার। আমাদের দুজনের খুব ভাব। ও বলে জীবনে ভাল বলতে কিছুই নেই। আমি বলি আছে, তবে তা গভীরে লুকিয়ে আছে যাতে বদমায়েশরা তার নাগাল না পায়।"

'জীবনের ভাল দিকটার' প্রতি গর্কির সতর্ক চোখ ছিল। তাকে তিনি যথেষ্ট মূল্য দিতেন, যত্নে লালন করতেন। তিফলিস শহর এবং সেখানে বন্ধুদের সম্পর্কে জীবনভোর তাঁর একটা মমতা মনের কোণায় বেঁচেছিল। কালিউঝনির প্রসঙ্গে সর্বদাই তিনি বলতেন "আমার পুরনো বন্ধু, আমার গুরু।"

অনেক বছর পরে তিনি কালিউঝনিকে লেখেন : "তুমিই প্রথম তোমার কোমল দুটি চোখের সহৃদয় আর স্মরণীয় দৃষ্টিপাতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে। বিচিত্র-জীবন তরুণের দিকে, উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের দিকে মানুষ যে-চোখে তাকায়, সেভাবে নয়।"

বাস্তবিক কালিউঝনিই প্রথম পেশকোভের দিকে ভাল চোখে তাকিয়েছিলেন। প্রথম তিনিই তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন।

সহজ স্টাইলে লিখতে তিনিই পেশকোভকে উপদেশ দেন। একদিন পেশকোভ তাঁকে জিপসি লোইকো জোবারের গল্প শোনান। কালিউঝনি তাঁকে বার বার অনুরোধ করেন গল্পটা লিখে ফেলার জন্য। গল্পটি শেষ পর্যন্ত তিনি লেখেনও—এইভাবে জন্ম নেয় 'মকর চুদ্রা' গল্পটি।

১৮৯২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর 'মকর চুদ্রা' গল্পটি 'কাভকাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম ছিল 'ম্যাকসিম গর্কি'। পেশকোভ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। গর্কি এই দিনটিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ বলে মনে করেন।

উঁচু দরের পত্রিকায় গর্কির প্রথম প্রকাশিত গল্প হল 'চেলকাশ'।

এর পরে বেসারাবিয়া ভ্রমণকালে বৃদ্ধা মহিলা ইজেরগিলের কাছে বসে শোনা গল্পের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা 'বুড়ি ইজেরগিল' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

সারাদিন সংবাদপত্রের লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন গর্কি। সন্ধ্যাগুলো কাটত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প আর পরিহাসে। গর্কি লিখতেন রাত জেগে বসে। তাঁর ডেস্কটি সব সময়ে থাকত ঝকঝকে। প্রত্যেকটি টুকিটাকি জিনিস ঠিক জায়গাটিতে গুছিয়ে রাখতেন। নিজের অবিন্যস্ত চুলগুলি কেবল হাওয়ায় উড়ত বলে একটা পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখতেন। ঠিক মুচিরা কাজের সময় যেমন করে চুল বাঁধে তেমনি।

গর্কির 'বাজপাখির গান' শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাঠচক্রে এটি আবৃত্তি করা হত প্রায়ই।

গর্কির 'মা'য়ের প্যাভেলের চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র ছিল বিপ্লবী শ্রমিক পিওতোর জালোমোভের। এই বিপ্লবী শ্রমিক 'বাজপাখির গান' সম্পর্কে একজায়গায় লিখেছিলেন "এটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে জারের শাসকেরা যে বোকামি করেছিল তাতে আমরা অবাক হয়েছিলাম।"

গর্কির প্রথম বই সারা দেশে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ক্রিমিয়া, ককেশাস এমনকি সুদূর সাইবেরিয়ার দূরাঞ্চলে আগ্রহের সঙ্গে মানুষ পড়তে লাগল তাঁর বই।

সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়াও গর্কি ক্রমশ গোপন বিপ্লবী কাজে ডুবে গেলেন। সোরমোভোর ইনজিনিয়ারিং শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করা, কারখানায় বিপ্লবী পাঠচক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, নির্বাসিত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা প্রভৃতি কাজে তিনি ডুবে গেলেন। স্থানীয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনের ইস্তাহার লিখতেন, বিপ্লবী সাহিত্য লুকিয়ে রাখতেন নিজের ঘরে। তাঁর পরিচিত এক ছুতোর, সে নিজেও একজন পুরনো বিপ্লবী ছিল, সে-ই গর্কির ডেস্কে কতকগুলি চোরাকুঠুরি তৈরি করে দিয়েছিল নিষিদ্ধ সাহিত্য লুকিয়ে রাখার জন্য।

গর্কি তখন তাঁর গল্প 'ফোমা গোরদেয়েভ' রচনা করছেন।

একটি চিঠিতে গর্কি এই গল্পটি সম্বন্ধে লিখেছেন: "আমাদের যুগের এক ব্যাপক বিরাট ছবির মতই আমি একে দেখি। যে-পটভূমিকায় একটি শক্ত সমর্থ, উৎসাহী মানুষ তার শক্তির যোগ্য এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধানে

লিও তলস্তয় ও ম্যাকসিম গর্কি, ইয়াসনায়া পলিয়ানা, ১৯০০

হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এই পরিবেশ তাকে খর্ব করে দিচ্ছে এবং সে বুঝতে পারছে এ ধরনের জীবন সাহসী মানুষকে কেমন করে গুঁড়িয়ে দেয়।"

বইটি যখন প্রকাশিত হল তখন নিঝনি-নভগোরদের ব্যবসাদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বলল—"এ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এমন লোককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান উচিৎ।"

গর্কি 'ফোমা গোরদেয়েভ' বইটি আন্তন চেকভকে উৎসর্গ করেন। চেকভের সঙ্গে তখনও গর্কির মাত্র চিঠিপত্রে পরিচয়।

গর্কি চেকভকে তাঁর বইটি পাঠিয়ে সঙ্গে যে-চিঠি লিখেছিলেন তার জবাবে চেকভ লেখেন: "তুমি জানতে চেয়েছ তোমার গল্প আমার কেমন লাগে? তোমার প্রতিভা সন্দেহাতীতভাবেই মহান।"

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে মস্কোতে ৭২ বছরের বৃদ্ধ তলস্তয়ের সঙ্গে গর্কির দেখা হয়। গর্কির কাছে তলস্তয় ছিলেন অদ্ভুত এক মানুষ। "তলস্তয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রয়োজনীয়ও বটে।"—একথা চেকভকে এক চিঠিতে পরে গর্কি লিখেছিলেন।

গর্কির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তলস্তয় তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন: "গর্কি এসেছিল। ভারি সুন্দর কথা বলে। ওকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। জনগণের ভিতর থেকে উঠে-আসা খাঁটি মানুষ।"

তলস্তয় আর চেকভের যুগে জন্মানো যে কতখানি সৌভাগ্যের কথা, তা জীবনে গর্কি বহুবার বলেছেন।

দেশ জুড়ে তখন জলোচ্ছ্বাসের মত এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থান আসছিল। গর্কি অনুভব করলেন নতুন কিছু, দুঃসাহসিক কিছু লেখার প্রয়োজন যাতে থাকবে নতুন বাণী, নতুন চিত্রকল্প। এই আকুলতাই তাঁর 'ঝড়ের পাখির গানে'।

গর্কির বয়স যখন তেত্রিশ তখনই তিনি একাধিক মহৎ রচনার স্রষ্টার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। নিঃস্ব নিপীড়িত জীবনের তিক্ততার কাহিনী তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়েছে। টাকা আর সম্মানের জন্য যে মুষ্টিমেয় একদল মানুষ সংখ্যাতীত এই নিপীড়িতদের জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা এনেছে তাদের তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করেছেন।

১৯০১ সালের এপ্রিলে 'ঝিজনি' পত্রিকায় 'ঝড়ের পাখির গান' প্রকাশিত হল। সেই মাসেই পুলিশ গর্কির বাড়ি খানাতল্লাসি করে। পেশকোভের ঠাকুমার বর্ণনায় তার খবর পাওয়া যায়: "গভীর রাতে সদর দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আলেকসেই ম্যাকসিমোভিচ (গর্কি—অনু.) গিয়ে দরজা খুলে দিল। পুলিশ বাড়িতে ঢুকতেই বাচ্চাটা কেঁদে উঠল—আমি ছুটে গেলাম তাকে শান্ত করতে। ওকে শান্ত করে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি ডেস্কের উপর

কনুইয়ে ভর দিয়ে আলেকসেই ম্যাকসিমোভিচ বসে আছে। শুনলাম একটি পুলিশের জবাবে সে বলছে : 'সবগুলো দেরাজ খুঁজে দেখতে পার'।...

"রাত একটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত তল্লাসি চলল। সারা বাড়ি তোলপাড় করে পুলিশ আলেকসেই ম্যাকসিমোভিচের চিঠিপত্র ও লেখা নিয়ে গেল আর তাকেও নিয়ে গেল গ্রেফ্‌তার করে।"

গর্কির গ্রেফ্‌তারে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন, জেলে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়বে সন্দেহ নেই। গর্কির মুক্তির দাবিতে লিও তলস্তয় এগিয়ে এলেন। শেষ

নিঝনি নভগোরোদে ম্যাকসিম গর্কি ও ফিয়োদোর শালিয়াপিন (১৯০২-১৯০৩)

পর্যন্ত গবর্নমেন্ট গর্কির কারাবাস মকুব করে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখলেন।

১৯০১ সালের নভেম্বরে গর্কিকে জানান হল, যে, তাঁকে আরজামাসে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর অসুস্থতার জন্য তিনি যদি ক্রিমিয়ায় চিকিৎসার জন্য যেতে চান তো যেতে পারেন।

১৯০২ সালের এপ্রিলের শেষে গর্কি ফিরে এলেন নিঝনি-নভগোরদে। মে দিবস উপলক্ষে তখন বিরাট মিছিলের আয়োজন চলছে। শ্রমিকদের মধ্যে গর্কির জনপ্রিয়তার কথা ভেবে পুলিশ সর্বদা তাঁর পিছু লেগে থাকত। হোটেলের বাইরে বেরোবার হুকুম ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে আরজামাসে পাঠান হল—সেখানে গিয়েই তাঁকে পুলিশে সংবাদ দিতে হবে।

এর ঠিক আগের বছর মস্কো আর্ট থিয়েটারকে গর্কি তাঁর 'ফিলিস্টাইনস' নাটকটি দেন। ১৯০২ সালের ২৬ মার্চ সেণ্ট পিতার্সবার্গে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই প্রথম রুশ রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল গর্কির নতুন নায়ক নিল। নায়ক নিল ইনজিন-ড্রাইভার, ভবিষ্যতে নিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে যার কোন সন্দেহই নেই। সেন্সর কর্তৃপক্ষ নাটকের বিপজ্জনক লাইনগুলো সব কেটে দিয়েছিল।

কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল নাটকের অভিনয় হয়তো শেষপর্যন্ত বিপ্লবী এক শোভাযাত্রায় পরিণত হতে পারে। নাটকের মহলার দিন থিয়েটার হলের চারপাশে পুলিস, সাদা-পোশাক পুলিস আর ঘোড়সওয়ার পাহারা বসিয়ে ছিল। ঘটনাটির উল্লেখ করতে গিয়ে পরে কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "পুলিসের বহর দেখে মনে হচ্ছিল নাটকের মহলা নয়, যেন কোন লড়াইয়ের মহড়া চলছে।"

'ফিলিস্টাইনের' পাশাপাশি গর্কির আর-একটি নাটক 'লোয়ার ডেপথস'। পুঁজিবাদী সমাজের সংগ্রাম এ নাটকে আরও তীব্র, আরও বীরত্বপূর্ণ।

১৯০২ সালের ১৮ ডিসেম্বর 'লোয়ার ডেপথসের' প্রথম অভিনয়। দিনটি ছিল গর্কির বিজয়ের দিন। দর্শকেরা বার বার দাবি জানাতে লাগল নাট্যকার, প্রযোজক ও অভিনেতাদের দেখতে চাই। অভিভূত গর্কি মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। হাতের জলন্ত সিগারেটটি ফেলে দিয়ে আসতে ভুলে গেছেন; ভুলে গেছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাতে। যারা টিকিট পায় নি তারা থিয়েটার হলের বাইরে ভীড় করেছে। সে ভীড়ের চাপ ঠেকানো সেদিন পুলিশের সাধ্য ছিল না। সকলেই তাদের গর্কিকে দেখতে চায়।

১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি 'ব্লাডি সানডে'র দিন রাস্তায় জনতার ভীড়ের

মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন গর্কি। তুলনাহীন সেই বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে তিনি মর্মাহত হন। "সমস্ত রুশ নাগরিক এবং ইওরোপের জনগণের" কাছে তিনি এক আবেদন রচনা করেন। এই আবেদনে জারকে এই পাইকারি খুনের হোতা বলে নিন্দা করে গর্কি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর সংগ্রামের ডাক দেন। এর পরেই বন্দী হয়ে গর্কি সেণ্ট পিটার দুর্গে আটক হন। এবার শুধু রুশ দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে গর্কির গ্রেফতারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। আনাতোল ফ্রাঁস গর্কির গ্রেফতারের প্রতিবাদে লেখেন: "গর্কির আদর্শ আমাদের সকলের আদর্শ। গর্কির মত প্রতিভা সারা পৃথিবীর সম্পদ। সারা পৃথিবী চায় গর্কির মুক্তি।" বস্তুত, এর কিছু পরেই গর্কি মুক্তি পেলেন।

১৯০৬ সালে বলশেভিক পার্টির নির্দেশে গর্কি ইওরোপে যান। ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেনে শ্রমজীবী মানুষের কাছে রুশ দেশের ঘটনাবলীর তাৎপর্য প্রচারের জন্য। বিদেশী গবর্নমেণ্টগুলি যাতে জার গবর্নমেণ্টকে অর্থ সাহায্য না দেয় তার জন্য প্রচার এবং সেই সঙ্গে বলশেভিকদের গোপন কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহও তাঁর বিদেশযাত্রার ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরপর গর্কি তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'মা' রচনার কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন। 'মা'য়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে লেনিন বলেছিলেন: "অত্যন্ত দরকারি, অত্যন্ত সময়োচিত একটি বই।" গর্কির জীবনে এর চেয়ে বড় সম্মান আর নেই। অনেক পরিশ্রমে রচিত হল 'মা'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেল। জার গবর্নমেণ্ট বইটি নিষিদ্ধ করে দিলেও রুশিয়ার দূরতম প্রান্তরে পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছল 'মা'। রুশদেশের বাইরে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়ে, গোপনে দেশের মধ্যে প্রচারিত হতে থাকল এই উপন্যাস।

১৯০৬ সালে গর্কি ইওরোপ থেকে দেশে ফিরতে পারলেন না। 'মা' প্রকাশের জন্য জার গবর্নমেণ্ট দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেফতার করবে। গর্কি ইতালির উপকূলে ক্যাপ্রি দ্বীপে অগত্যা তাঁর সাময়িক আস্তানা গড়ে তুললেন।

১৯০৭ সালে লণ্ডনে সারা রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে যোগ দেন গর্কি। এইখানে লেনিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে ওঠে। গর্কি ও লেনিন প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তবু লেনিন

কুয়োক্কালায় (ফিনল্যাণ্ড) এম. গর্কি, ভি. স্তাসোভ ও আই. রেপিন, ১৯০৪-১৯০৫

ছিলেন গর্কির জীবনে "শিক্ষক ও বন্ধু।" লেনিনের বোন মারিয়া উলিয়ানোভা লিখেছেন : "গর্কিকে যেমন ভালবাসতেন লেনিন তেমনটি খুব কম লোককেই বাসতেন।"

ক্যাপ্রিতে গর্কির সাতটা বছর কাটল। সাত বছরে ক্যাপ্রিকে তিনি ভালবেসে ফেলেছিলেন।

কিন্তু দেশের প্রতি গর্কির মন পড়েছিল। রুশিয়াতে তখন প্রচণ্ড নিপীড়নের যুগ চলেছে ; বিপ্লবীদের, বিশেষ করে বলশেভিকদের উপর জার গবর্নমেণ্ট প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছে। কয়েদখানাগুলি ভর্তি হয়ে গেছে, অসংখ্য বিপ্লবী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। দুর্দিনের আভাসে দুর্বল-চিত্ত কাপুরুষেরা পার্টি ছেড়ে পালাচ্ছে। দুঃসময়কে উপেক্ষা করে যারা রয়ে গেছে তারা সংগ্রামের আগুনে পোড় খেয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের

চোখে আদর্শের প্রতি প্রত্যয় বেড়েছে। এই অবস্থায়, আক্রমণের মুখে পার্টি গোপনে কাজ করে চলেছে। দেশের সংবাদ গর্কিকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

১৯১০ সালে ক্যাপ্রিতে লেনিন গর্কির সঙ্গে দেখা করেন; এ সাক্ষাৎকার গর্কিকে অত্যন্ত খুশি করেছিল। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন আগে গর্কি রুশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন। গর্কির মনপ্রাণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। জাতিতে-জাতিতে শান্তির পক্ষে ছিলেন তিনি; 'কাহিনী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতে লাগলেন। পত্রিকাটি মারফৎ গর্কি প্রচার চালাতে লাগলেন, যুদ্ধ বুর্জোয়াদেরই স্বার্থে; সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে জনসভায় দাঁড়িয়ে আমরা গর্কিকে বলতে শুনি: "আমরা নতুন ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছি।"

জনগণের কাজে গর্কি সমস্তরকম পরিশ্রমকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। সভায় বক্তৃতা দিয়ে, পাঠচক্র সংগঠিত করে, সংবাদ সংগ্রহ করে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরেছেন। মিলিশিয়া ক্লাব সংগঠন করে সৈন্যদের কাছে ফ্রন্টে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

গর্কির জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল রুশ দেশের জনগণের কাছে "সারা বিশ্বের কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার"কে তুলে ধরবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রকাশনবিভাগ গড়ে তোলেন। লক্ষ লক্ষ রুশ জনসাধারণ যারা নব জীবন গড়ছে তাদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের জন্য বই ও পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। বিজ্ঞানীদের তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাজে।

রুশিয়া তখন ঘোর দুর্দিনের মধ্য দিয়ে চলেছে। দেশে দুর্ভিক্ষ আর টাইফাসের মহামারী। প্রচণ্ড পরিশ্রমে গর্কির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বন্ধুরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললে তিনি বলতেন: "বিশ্রামের সময় নেই আমার।" কিন্তু শুধু তো বিশ্রাম নয়, তাঁর চিকিৎসারও প্রয়োজন। লেনিনের জবরদস্তিতে শেষপর্যন্ত তিনি চিকিৎসার্থে বাইরে যেতে রাজি হলেন।

গর্কি প্রথম গেলেন জার্মানিতে, তারপর ইতালির 'সরেনটো'তে কয়েক বছর বাস করেন।

অবশেষে ২৪ জানুয়ারি খবর পৌঁছল লেনিন মারা গেছেন। খবর

গর্কি অনাথ আশ্রমে বিশিষ্ট সোভিয়েত শিক্ষাবিদ এ. মাকারেঙ্কোর সঙ্গে
ম্যাকসিম গর্কি

শুনে গর্কি স্তম্ভিত হলেন, জীবনে এই মুহূর্তে যেন তিনি প্রকৃত 'অনাথ' হলেন। লেনিনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গর্কি লিখলেন, "বেদনায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে···কর্ণধার জাহাজ ছেড়ে চলে গেলেন।" লেনিনকে ছাড়া জীবন কল্পনা করা শক্ত। জীবনের আনন্দ ও সুখের পথ তো তিনিই দেখিয়েছেন। লেনিনের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত গর্কি শুধু লেনিন-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে বা বলতে পারেন নি। এই সময়েই লেনিন সম্বন্ধে তাঁর সেই বিখ্যাত রচনার সৃষ্টি।

শ্রমিকের কাছে গর্কির রচনার তাৎপর্য যে কতখানি, লেনিন তা গর্কিকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন। লেনিনের মৃত্যুর পর গর্কি প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছেন লেনিনের এই বিশ্বাসের যোগ্য হতে। আত্মজীবনী-মূলক রচনার তৃতীয় খণ্ড 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' তিনি এই সময়ে শেষ

করেন। এই সময়েই লেখেন 'আর্তামোনোভ্‌স'। তারপর গর্কি তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'ক্লিম সামগিনের জীবন' রচনায় হাত দেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পটভূমিতে রুশ জীবনের চিত্র এঁকেছেন গর্কি এই উপন্যাসে।

১৮৩৮ সালে গর্কি স্বদেশে ফিরে এলেন। পথে পথে, রেলস্টেশনে বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানাল। ২৮ মে এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে মস্কোতে এসে পৌঁছলেন তিনি।

রাজধানীতে গর্কি বেশিদিন রইলেন না। বেরিয়ে পড়লেন আবার মুসাফিরের মত ভোলগা, ককেশাস, ক্রিমিয়া, উক্রাইন, মুরমানস্কের পাহাড়ে, বনভূমিতে, প্রান্তরে, নদীর তীরে, তাঁর সেই ছোটবেলার ভ্রাম্যমাণ জগতে। রুশিয়াতে তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগ চলেছে। নতুন শিল্প সংগঠন, নতুন নাগরিক এদের দিকে তাকিয়ে গর্কির মন ভরে উঠত।

ছোটদের জন্য গর্কির স্নেহ ছিল একটু বেশি। তাঁর চোখে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। ছোটরাও গর্কিকে ভীষণ ভালবাসত—নিয়মিত তাঁর কাছে চিঠি লিখত। এতে গর্কির মনে গর্বের অন্ত ছিল না। ছোটদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "জীবনের শেষ বছরগুলি আমার বিশেষ আনন্দে কাটছে, কারণ দেখতে পাচ্ছি বুড়ো লোকদের জায়গা দখল করতে বিরাট সাহসে ভর দিয়ে তোমরা তৈরী হচ্ছ।"

গর্কির ইচ্ছা ছিল ছোটদের জন্য একটি বিরাট বই লিখবেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনের কথা, সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে উঠে-আসা 'বীরদের গল্প' যে-বীরেরা আমাদের পৃথিবীকে অপরূপ সজ্জায় সাজিয়ে তুলছে তাদের কথা ছোটদের জন্য লেখা শুরু করলেন।

গর্কির সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন গর্কি মারা যান।

এ, পি, এন

লেনিন ও গর্কি

অধ্যাপক এ. মিয়াজনিকোভ

লেনিন যেমন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম স্রষ্টা, গর্কি তেমনি উন্মুক্ত করেছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। প্রগতিশীল মানুষ মাত্রেরই চোখে বিরাট প্রতিভাশালী শ্রমিকশ্রেণীর নেতা লেনিন এবং মহান প্রলেতারিয় সাহিত্যিক গর্কি—এঁরা দুজন একই বিপ্লবের সহযাত্রী। সে বিপ্লবই নতুন পৃথিবীর জন্মের ধাত্রী।

লেনিন ও গর্কি দুটি বিরাট ব্যক্তিত্ব। এ দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই নিজস্ব জটিল জগৎ, বুদ্ধির জগৎ ও আবেগের অভিজ্ঞতায় স্বতন্ত্র। তাঁরা হয়তো পরস্পরের চিন্তার ভাগ নিয়েছেন, হয়তো তর্ক করেছেন অনেক বিষয় নিয়ে, সে তর্কে হয়তো কখনও হার মেনেছেন কখনও মানেন নি কিন্তু কর্তৃত্বের কাছে মাথা নিচু করা তাঁদের সম্পর্কের ধাতে সইত না।

সুতরাং সেই মহান লেখক যাতে সঠিক পথের সন্ধান পান, যাতে তাঁর দেশ ও জনগণের সেবায় লাগতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে গর্কিকে 'ঈশ্বর সন্ধানে'র পথ থেকে ফেরাতে, বিপ্লবী কৃষকের প্রতি তাঁর আস্থা পুনরুদ্ধার করতে এবং রাজনীতিতে তাঁর 'আঁকা বাঁকা' পথে বিচরণের ভুল সংশোধনে লেনিনকে যে কী পরিমাণ কৌশল, ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলের পরিচয় দিতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া এর জন্য প্রয়োজন নিজ আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর সেই মহান সাহিত্যিকের নির্মল মনে সাময়িক বিহ্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা। এর জন্য সময় সময় লেনিনের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতা অর্জন করতে গর্কিকে মনের সঙ্গে কঠিন বোঝাপড়া করতে হত। এসব খবর আমরা পাই গর্কি ও লেনিন উভয়ের পত্রাবলী, স্মৃতিকথা এবং প্রবন্ধ থেকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, বিপ্লব, লেনিন এবং সমাজতন্ত্রের সত্য শেষপর্যন্ত গর্কিকে জয় করতে পেরেছিল। সেই সাহিত্যিক ও বিপ্লবের সেই নেতা উভয়েই শেষপর্যন্ত

একটি অভিন্ন প্রশ্নে এসে একমত হতেন, কী করে জনসাধারণকে তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করা যায়।

বিরাট এক রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক রূপে বহুমুখী অসাধারণ প্রতিভাবান, সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরূপে ছিল গর্কির কাছে লেনিনের আকর্ষণ। যে-গুণ গর্কি অপরের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন কিন্তু কারও মধ্যে পান নি সেই পরম মূল্যবান গুণের দেখা পেয়েছিলেন তিনি লেনিনের চরিত্রে। লেনিনের চরিত্রচিত্রণে গর্কির পথ খুলে দিয়েছিল 'বাজপাখি', 'ঝড়ের পাখি' প্রভৃতি চিত্রকল্প এবং নিয়েল, পাভেল ভ্লাসোভ, স্তেপান কুতুজোভ এবং পরবর্তীকালে বিয়াবিলিন প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গর্কির লেখা লেনিনের স্মৃতিকথায় ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায় সেই মহান মানুষটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

গর্কির রচনার মধ্য দিয়ে লেনিনের বিরাট এক অতি সুন্দর মানবিক রূপ ফুটে ওঠে। পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে বক্তৃতারত লেনিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর মধ্যে গর্কি দেখতে পেয়েছেন ধ্রুপদী শিল্পের মতই এক মহিমান্বিত রূপ। কিন্তু গর্কি কখনও সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এক নিছক মহত্ত্বের ছবি আঁকেন নি। গভীর মানবীয় স্পর্শে তাঁকে প্রাণবন্ত করেছেন। রুশিয়ার শ্রমজীবী মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে লেনিনের আগ্রহের অন্ত নেই। হোটেলের স্যাঁতসেঁতে ঘরে গর্কির বিছানার ভেজা চাদরটি দেখে লেনিনের ভাবনা হয়েছিল হয়তো গর্কির ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। মানুষের জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির প্রতি যেমন ঠিক তেমনি জনগণের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতিও লেনিনের সমান নজর। ইতিহাস সম্ভবত এই কারণেই গর্কির এত 'অনুগত' ছিল।

যেন নিরাভরণ সত্য—লেনিন সম্পর্কে শ্রমিকেরা বলত। গর্কির কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, লেনিন যখন জনসাধারণের কাছে দাঁড়িয়ে অকপটভাবে খোলাখুলি সবকিছু বলতেন তখন তাঁর বক্তৃতার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত কঠিন সত্যের এক রেখাচিত্র।

জীবনে দুর্ভাগ্য যেন এক অমোঘ বিধান, কোন নড়চড় নেই—একথা লেনিন বিশ্বাস করতেন না। দুঃখ-বেদনাকে তিনি ঘৃণা করেছেন, মানুষের সুখী জীবনের জন্য তিনি লড়েছেন। "চরিত্রের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বলা যায় বস্তুবাদীর সংগ্রামী আশাবাদ" গর্কি বিশেষ জোরের সঙ্গে এই

১৯২০ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভি. আই. লেনিন ও ম্যাকসিম গর্কি

কথা বলেছেন। এই বৈশিষ্ট্যই গর্কিকে লেনিনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। গর্কি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর সম্পর্কে উল্লেখে মানুষ শব্দটির আদ্যক্ষর বড় হাতে লিখতে হয়।" গর্কির আঁকা লেনিনের চরিত্রচিত্র থেকে আমরা বিপ্লবের সেই মহান নেতার বিরাট ব্যক্তিত্বের গভীর পরিচয় পাই।

১৯০৫ সালে 'নোভায়া ঝিজন্' পত্রিকায় প্রকাশিত লেনিনের প্রবন্ধ "পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য" সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার এক নতুন পথ খুলে দিল। গর্কি এই পত্রিকার অন্যতম পাঠক ছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেনিন বলেন প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে তারই স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজনীতি, দর্শন, নীতিবোধ প্রভৃতির সংযোগসাধন এই হবে পার্টির নীতি। আবার অন্যদিকে সাহিত্যের কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও রয়েছে (লেনিন মনে করতেন এ বিষয়ে কোন প্রশ্নেরই অবকাশ নেই)। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত সাহিত্য কেবল নন্দনতত্ত্বের রাজ্যেই ঘুরপাক খেতে পারে না। ফর্মালিস্টরা অবশ্য এর বিপরীতটাই বিশ্বাস করে এবং করত। সামাজিক চিন্তা-সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ সাহিত্য প্রাণহীন কোন বস্তু নয়, এ এক প্রাণবন্ত বিষয়।

শিল্পীর প্রতিভার প্রতি লেনিনের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ১৯১৩ সালে লেনিন লিখেছেন, প্রতিভা এক দুষ্প্রাপ্য জিনিস—এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত উৎসাহ। সারা জীবন ধরেই লেনিন গর্কির প্রতিভাকে উৎসাহ দান করে এসেছেন। অনেকবারই তিনি বলেছেন যে এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাঁর প্রতিভা ও ক্ষমতা দিয়েই বিপ্লবের সেবা করে চলেছেন। ১৯০৯ সালে লেনিন বলেন গর্কির সাহিত্যপ্রতিভা রুশিয়ার এবং সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনকে বিরাটভাবে সাহায্য করছে। একথা তিনি আরও অনেক-বারই বলেছেন। লেনিন যখন গর্কির সমালোচনা করেছেন তখনও তিনি রাজনীতিবিদের ও শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখার ও বোঝার মধ্যেকার পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপের জটিল পারস্পরিক টানাপোড়েনের কথা উল্লেখ করেছেন।

সকলপ্রকার সম্ভাব্য পথে লেনিন চেয়েছিলেন গর্কিকে রাজনৈতিক জীবনের গভীরে টেনে আনতে। কিন্তু তার ফলে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক-

রূপে তাঁর ভূমিকা বিন্দুমাত্র যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার দিকেও লেনিনের নজর ছিল।

বড় বড় রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে আমন্ত্রণ আসত গর্কির। গর্কির

ক্যাপ্রিতে এ. বোগদানভ ও ম্যাকসিম গর্কির সঙ্গে লেনিন, ১৯০৮

কাছে লেখা চিঠিতে লেনিন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও দার্শনিক সমস্যা এবং পার্টির কাজের এবং বড় বড় পত্রিকাগুলির রাজনৈতিক মতিগতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। বিরুদ্ধবাদী তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা একটা

আষাঢ়ে গল্প চালু করেছে যে সমাজচিন্তার এক বিশেষ রূপ হিসাবে শিল্পের স্পর্শকাতরতাকে উপলব্ধি করার আগ্রহ সোভিয়েত সাহিত্যিকদের খুব কমই আছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু থেকে তার রূপকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখে ফরাসী লেখক রোঁবে গ্রিলে সম্প্রতি লেনিনগ্রাদে লেখক ও সমালোচকদের সমাবেশে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত সমালোচকেরা, অর্থাৎ বুর্জোয়া সমালোচকেরা মনে করেন যে লেখক কী বলছেন সেটা বড় কথা নয়, পরন্তু কীভাবে বলছেন সেইটাই বড় কথা। আমেরিকার শিল্প-সমালোচক ম্যাক্স রিয়েজার বলেন যে তাঁর মতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে "বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নন্দনতত্ত্ব", অন্যদিকে পশ্চিমী নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে "রূপবিষয়ক নন্দনতত্ত্ব"। এ দুয়ের মিলন সম্ভব নয়।

লেনিন অথবা গর্কি কেউই শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে রূপের বিরোধী বলে মনে করতেন না এবং শিল্পের স্পর্শকাতরতা ও সামাজিক দায়িত্ব নিরূপণে সচেষ্ট ছিলেন।

হাল আমলে নয় বিগত শতকের শেষ দশকে গর্কি সাহিত্যে স্বাভাবিক-বাদ ও অবক্ষয়বাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা জীবনকে দলিলের মত হুবহু করে আঁকার পক্ষপাতী, অন্যদিকে অবক্ষয়বাদীরা শিল্পকে জীবনের প্রতিফলনের পরিবর্তে শিল্পীর বিষয়ীগত ধারণার প্রতিফলনরূপে দেখে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই গর্কির চোখে অসহ্য মনে হত।

যদিও ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল গর্কির তবুও তিনি মনে করতেন যে জীবন ও সংগ্রামের নতুন পরিবেশে সমালোচনামূলক বাস্তবতা-বাদের একটা ঐতিহাসিক সীমারেখা আছে। তিনি চেকভকে লিখেছিলেন যে বর্তমানে কালের দাবি হচ্ছে বীরত্ব। জনসাধারণ এমন একটা কিছু চায় যা তাদের উদ্বেল করে তুলবে, যা তাদের জাগাবে এবং যা বাস্তবের চেয়েও সুন্দর। গর্কির সৃষ্ট শিল্প সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এদিক থেকে সে-শিল্প সাধারণত্বকে ছাড়িয়ে ঊর্ধে উঠে গেছে। গর্কির সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আগামীকালের বর্তমান রূপ-রেখাই ফুটে উঠেছে। ফলে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার সংগ্রামে সে সাহিত্য প্রভূত সাহায্য করেছে।

বিপ্লবের অনতিকাল পরের বছরগুলিতেও গর্কির সুদৃঢ় ধারণা ছিল বীরত্বের কাহিনী এবং ব্যক্তির মহিমার পথই নতুন সাহিত্যের পথ। সে সময়ে গর্কি অস্ত্রোভস্কি, চেকভ এমনকি তাঁর নিজের নাটককেও ছোট করে দেখেছেন। সে সময়ে লেনিন তাঁকে সংশোধন করে দেন। লেনিন বলেন গীতিকাব্য, চেকভ এবং কঠিন সত্য—এ সবেরই প্রয়োজন আছে।

গর্কির 'মা' প্রকাশিত হবার আগেই লেনিন তার পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন—এ খবর আমরা জানি। উপন্যাসের শিক্ষাপ্রদ মূল্য এবং এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে লেনিনের উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন অন্যান্য ভাষায় এই অতি প্রয়োজনীয় উপন্যাসের অনুবাদ হচ্ছে কি না। গর্কিকে তিনি শুধু বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিকরূপেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দিকপালরূপেও দেখতেন।

কিন্তু 'মা' উপন্যাসের প্রশংসার পাশাপাশি লেনিন তার ত্রুটিগুলোও দেখিয়েছেন। লেনিনের মতে এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের আদর্শবাদী মহিমা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে। লেনিনের সমালোচনা স্মরণে রেখেই পরের সংস্করণে বহুবার উপন্যাসটিতে মার্জনা ও সংশোধন করেছেন গর্কি।

অক্টোবর বিপ্লবের পর শিল্পে নতুন পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেনিনের প্রজ্ঞা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন গর্কি। গর্কি লিখেছেন লেনিনের সত্তার অর্ধেকটা ছিল ভবিষ্যতের পথ চেয়ে; লেনিন ভবিষ্যতের চোখে বর্তমানকে দেখার ক্ষমতা রাখতেন। সমালোচক এবং স্রষ্টা এই দুই বিরোধী ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছিল লেনিনের চরিত্রে। একদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি যেমন লেনিনের প্রখর ছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়ের উর্ধে উঠে ব্যাপকতম সামান্যীকরণের ক্ষেত্রে চলে যেত পারত তাঁর চিন্তা। লেনিনের এই অপরিসীম ক্ষমতায় গর্কি বিস্মিত হতেন। শক্তিশালী এক 'আত্মিক দৃষ্টির' অধিকারী ছিলেন লেনিন। অর্থাৎ আইডিয়া কীভাবে জীবনে রূপ পরিগ্রহ করছে লেনিন তাই দেখতে পেতেন।

গর্কি প্রদর্শিত নতুন শিল্পরীতি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে তাঁর লেখা দুটি চিঠি থেকে। একটি চিঠি লেখা গ্রুজদেভাকে, অন্যটি লেখা আফিনোজেনোফের কাছে। দুটো চিঠিই লেখা ১৯৩৩ সালে। এই দুটি

চিঠিতে গর্কি নিজের ভুলের কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন লেনিনের সঙ্গে তাঁর তথাকথিত "মতবিরোধ" থেকে গৃহীত শিক্ষার কথা। তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে বড্ড বেশি মূল্য দিয়েছেন, ফলে নিজেই তিনি প্রয়োগবাদের খপ্পরে পড়ে গেছেন—একথা গর্কি নিজেই বলেছেন। লেনিন ছিলেন গভীর চিন্তানায়ক, জীবনের অতল ধারায় তিনি অনায়াসে ডুবে যেতে পারতেন—এ গর্কির স্বীকৃতি। ভবিষ্যৎকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' ভিত্তি। সোভিয়েত সাহিত্যের নতুন রীতিরূপে এই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নিয়ে তখন আলোচনা চলছে। গর্কি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে একথা বলেন।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গর্কি কানাগলির পথ দেখান নি। এই নতুন সাহিত্যরীতির বিভিন্ন দিকের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধর্ম হচ্ছে কর্মনিষ্ঠ জীবনকে রূপ দেওয়া, মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতার এবং সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের বিকাশ সাধন। জীবনের সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলন এবং বিপ্লবী রোমান্টিকতা, এ দুয়ের সমন্বয় সাধন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কর্তব্য। জীবন চিরকালই গতিশীল, এই বিশ্বাসই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল বিধান।

গর্কির লেখা এবং তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মতামত সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ায় যে আষাঢ়ে গল্প চালু আছে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্পর্কে গর্কির সংজ্ঞাই প্রমাণ করে পশ্চিমী দেশের এই সমালোচনা কত অবাস্তব। রক্ষণশীল নন্দন-চিন্তা নয়, বিপ্লবী নন্দনতত্ত্ব যা যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত—সেই নন্দনতত্ত্বের উদ্‌গাতা ছিলেন লেনিন ও গর্কি। গর্কি তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন যে তিনি সেই নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী, যে-নন্দনতত্ত্ব ন্যায়বিচারের আদর্শে প্রতিশ্রুত, যে-নন্দনতত্ত্ব পৃথিবীর আত্মিক পুনরুজ্জীবনকে সম্ভব করে। এই ছিল লেনিন ও গর্কি উভয়েরই সাহিত্য ও শিল্প চিন্তা।

গর্কির সমাজতান্ত্রিক মানবিকবাদ

য়েভগেনি ক্‌নিপোভিচ্‌

১৯২৭ সালে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের দশম বার্ষিকীর উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর প্রবন্ধের শেষে আলেকসেই ম্যাকসিমোভিচ গর্কি "নতুন রুশীয় মানবসমাজ"কে, "যথার্থই নতুন এক পৃথিবীর" নির্মাতাদের, "পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে অপরিহার্য মানবগোষ্ঠী"কে সৌভ্রাত্র্যপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

যে-সমাজের ইচ্ছাশক্তি, আবেগ ও ঘৃণা গর্কির অননুকরণীয় প্রতিভাকে রূপ দিয়েছিল, লালন করেছিল, তিনি সেই সমাজকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গর্কি তাঁর নিজের শ্রেণীর সঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রচনায় মূর্ত হয়েছে জারতন্ত্রী রুশিয়ার এশীয় ধাঁচের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবহেলিত সন্তান লক্ষ লক্ষ "ক্ষুদে মানুষের", "মার-খাওয়া মানুষের" জীবনাভিজ্ঞতা ও অদৃষ্ট। যে-মানুষেরা গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের পাঠশালায়, কারাগারে, নির্বাসনে, কয়েদীর সশ্রম দণ্ডাদেশ পালনে, পৃথিবীর মহত্তম বিপ্লবে, গৃহযুদ্ধে, এবং "যথার্থই নতুন এক পৃথিবীর" নির্মাণকল্পে বীরত্বপূর্ণ জয়যুক্ত সংগ্রামের পথে মানুষ হয়ে উঠেছেন, গর্কি তাঁর রচনায় তাঁদেরই জীবন চিত্রিত করেছেন।

এই যে "নতুন রুশীয় মানবসমাজ" অতীত-বর্তমানের সংস্কৃতির শীর্ষারোহণ করেছে, এই মানবগোষ্ঠীরই সমগ্র ভাবাদর্শগত শৌর্য গর্কির রচনায় প্রতিফলিত। আমাদের বিজ্ঞানী, কলকারখানার শ্রমিক এবং সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের কীর্তির মধ্যে যে নতুন অভূতপূর্ব চেতনা লক্ষ করা যায়, গর্কির রচনাও সেই চেতনায় চিহ্নিত। এই সমূহ লক্ষণই স্বাধীন মানুষের স্বাধীন শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক ও অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই লক্ষণ।

সেই কারণেই গর্কি যখন অতীত-বর্তমানের শিল্পীদের সারিতে যোগ

রোমাঁ রলাঁ্যার সঙ্গে গর্কি

দিলেন, তিনি কেবল রুশ সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের ধারক ও উত্তরাধিকারীরূপে আসেন নি; তিনি এসেছেন সোভিয়েত জনগণের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রথম প্রতিনিধিরূপে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গর্কির মানবিকবাদের নতুনত্ব অনুধাবন করতে গেলে, যে-কালপরিবেশে গর্কি লেখক হয়ে উঠেছিলেন, বা যে ভাবাদর্শগত-শিল্পগত পটভূমিকায় তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার বিবর্তন ঘটেছিল, সর্বপ্রথমেই তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতির মূল্য প্রতিষ্ঠায় জনগণের ভূমিকা, বৈপ্লবিক চেতনা ও যথার্থ মানবিকবাদের মধ্যে সম্পর্ক, এবং অতীত-বর্তমানের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নির্বিত্তশ্রেণীর তর্কাতীত অধিকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই, শুধু সোভিয়েত শিল্পীদের মধ্যেই নয় (সেটা তো স্বাভাবিকই), পাশ্চাত্ত্যের যথার্থই সংস্কৃতিমান সেরা মানুষগুলির কাছেও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু

পাশ্চাত্ত্যের সেরা মানুষগুলি এই শিক্ষালাভ করেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর, বিশ্ব ইতিহাসের তৎপরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে এবং বিশেষ-ভাবে আমাদের এই গ্রহের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে নির্বিত্তশ্রেণীর জয়লাভ থেকেই।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল রুশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মেষপর্ব। ১৯১৭র ফেব্রুয়ারি মাসে ঐতিহাসিক বিকাশের যে-পর্বের পরিণতি ঘটে, এই কালটি সেই পর্বেরই ভূমিকা এবং বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের উপসংহার। এই সময়ের মধ্যেই সমাজচেতনায় এক গভীর সংকট এসে পড়েছে। "শিক্ষিত সমাজ" ও "রুশীয় সমাজচিন্তা"র ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। "পিতৃপুরুষ"দের দেউলিয়াপনা; 'নারোদনিচেস্ত্ভো' আন্দোলনের ক্রমবিলোপ; বুর্জোয়া উদারতন্ত্রের মধ্যে ক্রমে তার আত্মবিলোপ; রুশীয় মার্কসবাদের নবজন্ম; জারতন্ত্রী রুশিয়ার ভিত্তিমূল যে-ভূমিকম্পে পরবর্তী-কালে ধ্বসে পড়ে, তারই প্রথম মৃদু কম্পন; এইসব মিলিয়েই এই কালের চরিত্র।

গর্কির রচনায় গভীরতম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর কালের সমাজে যে বিরাট ফাটল দেখা দিচ্ছিল, তার রূপ। তাঁর রচনায় যে-কণ্ঠস্বর শোনা যায় সে কণ্ঠস্বর রুশ শ্রমিকের, রুশ নির্বিত্তশ্রেণীর; যে-শ্রমিকশ্রেণী পুরনো ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিতে আর রাজি নয়, তাদের কণ্ঠস্বর; যারা শান্তি, যথার্থ শান্তি, তাদের হাতে-গড়া যাবতীয় সম্পদে তাদের অধিকারের সপক্ষে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের কণ্ঠস্বর।

গর্কি ছিলেন রোম্যান্টিকবাদী। কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিকতন্ত্র পৃথিবী সম্পর্কে বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত নয়; কুশলী, কর্মী মানুষের হাতের স্পর্শে সাড়া দেবে বলে যে প্রাণময় সুফলা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে তার জায়গায় "কোন গায়কের খামখেয়ালী পাগলামি"র সৃষ্টি অন্য এক কল্পলোক প্রতিষ্ঠার সাধ থেকেও উদ্ভূত নয়। গর্কি এই রোম্যান্টিকবাদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিলেন আরেক রোম্যান্টিকবাদ—"পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংযোগের চেতনা, এবং এই চেতনা থেকে উৎসারিত সৃষ্টিক্ষমতার মাটিতেই এর জন্ম।" গর্কি বলেছিলেন, "এই বিশেষ ধরনটি সবে দেখা যাচ্ছে, সবে রূপ নিচ্ছে; যে-শ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক বন্দিদশা থেকে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তিদানের সমাজবাদী ধারণার প্রবর্তকরূপে, মহান সৌভ্রাত্র্যপূর্ণ স্বাধীন শ্রম

তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহতী ধারণার প্রবর্তকরূপে জীবনে প্রবেশ করছে, সেই শ্রেণীর মধ্যেই আমরা এই ধারাটি প্রত্যক্ষ করছি।"

গর্কির প্রোলেতারিয় বৈপ্লবিক মানবিকবাদ তাঁর সমকালীন পশ্চিমী সংস্কৃতিনায়কদের মানবিকবাদকে অস্বীকার করে নি। গর্কির রচনার মধ্যে দিয়ে নির্বিত্তশ্রেণী পশ্চিমী শিল্পীদের সামনে সঠিক পথ নির্দেশ করে দেয়, সংকীর্ণতা, ক্লীবতা ও ভয়ের মুখোশ খুলে দেয়।

যে-মানবিকবাদ করুণায় প্রতিষ্ঠিত, তার জায়গায় গর্কি আনলেন

আলেকসেই তলস্তয় ও ম্যাকসিম গর্কি, ১৯৩৪

"করুণার চেয়ে অধিক মূল্যবহ" সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিকবাদ। "ভদ্রজনোচিত অবজ্ঞা"র জায়গায় তিনি আনলেন মানুষের প্রতি ভাবাবেগ-রহিত দায়িত্বসম্পন্ন শ্রদ্ধার ভাব। মিনারবাসী "স্বয়ম্ভু মহাপুরুষের" পূজা না করে তিনি সকল সাংস্কৃতিক সম্পদের যথার্থ স্রষ্টা কোটি কোটি মানুষের জনসংহতিকে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। সৃষ্টি-চেতনার বস্তুবিচ্ছিন্ন স্তরের হিরন্ময়, মায়া-ধরানো কোন অতিমানব রচনা না করে গর্কি সৃষ্টি করলেন সেই সংগ্রামী মানুষকে যে তার শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যেই

নিজের বীরত্ব প্রমাণ করে, মহাবলী হয়ে ওঠে। গর্কি বারংবার শিল্পী ও পৃথিবীর মধ্যে সংযোগের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন, বাস্তববিচ্যুত শিল্প-লোকের মিথ্যা মায়াজাল বারবার ছিন্ন করেছেন। গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি মানবলোকের ধ্বজাবাহীদের কাছে মানবজাতির বহুবিচিত্র সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকার ও পথের কথা তুলে ধরেছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছে গর্কির মানবিকবাদের গভীর প্রোলেতারিয় সারবস্তু—অধিকারহীনতা ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্তরিক প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত পুঁজির জগতের বিরুদ্ধে অসন্তোষের প্রতিটি সৎ প্রকাশ এবং মানুষের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি যথার্থ অনুরাগের প্রতিটি প্রকাশকে তিনি সম্মান করেছেন।

অত্যাচারিত মানুষের হয়ে শোষণের জগৎ তথা ব্যক্তিগত পুঁজির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কাছে গর্কি যে-ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন, তা বিপুল।

ইগোশার ("পকেটে মৃত্যু") কথাই ধরুন—নিঝনি-নভগে রোদের সেই হাবা মানুষটা,—ক্ষুধার্ত, জীর্ণবাস, সন্ত্রস্ত। নয়তো পানাশকিনা নামে সেই মেয়েটি—বিষাক্ত রক্তে তার সারা দেহ নীল হয়ে গেছে—তবু সে স্বপ্ন দেখে "এক লেফ্‌টেনান্টের সঙ্গে তার আবেগমথিত প্রেম।"

মানুষের নিষ্ঠুরতা? তা-ও আছে। নির্দয় জান্তব আক্রোশের শিকার হয়ে মার খায়, নির্যাতিত হয় ইয়াকভ ("তিনজন"), বুবেনচিক ("পৃথিবীর পথে"), কোসকা ক্লিয়ুচারেভ ("দর্শকশ্রেণী")। অর্থহীনভাবে বিধ্বস্ত জীবনের যন্ত্রণায় উদ্‌ভূত আক্রোশের তাড়নায় যে-নারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তাঁদের কথাও স্মরণ করুন—নিলোভনা ("মা"), অরলোভা ("অরলোভ দম্পতি") বা নিকোনোভের মায়ের ("গ্রীষ্ম") মত অসংখ্য নির্যাতিতা রুশ নারী গর্কির গল্পে অবিস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

মাতৃত্ব কঠিন অভিজ্ঞতা। গর্কি শুনিয়েছেন সেইসব মায়েদের কথা যাঁদের কাছ থেকে সমাজ ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁদের গর্ভের সন্তান, বুটের আঘাতে সেই সন্তানকে পিষে মেরেছে, হয় জারতন্ত্রের অপরাধে নয়তো নিতান্তই একঘেয়ে রুশিয় জীবনযাত্রার অবসাদ কাটাবার জন্য। এই একঘেয়েমির চাপে মানুষ অন্যকে অপমান করে, বিপদে ফেলে শান্তি পায়—"যে অন্তহীন একঘেয়ে দিনগুলো কাটতেই চায় না, তার মধ্যে আগুন

লাগাটাও উপভোগ্য হয়ে ওঠে; একটা নিষ্প্রাণ মুখে আঁচড়ের দাগও যেন শোভাবর্ধন করে।"

দুর্বলকে অপদস্থ করে নিজের হীন স্বৈরাচারী প্রবৃত্তির ক্ষমতা পরীক্ষা করা, মারামারি, মাতলামি, রক্তাক্ত "রসিকতা", পুরনো বন্ধুদেরই খুন-জখম —এই "ভয়ংকর জগৎ", "অমানুষদের" এই পৃথিবী গর্কি নিজের চোখে দেখেছিলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মেহনতি মানুষের অমর্যাদা এইখানে এসে পৌঁছেচে।

"শূন্য হৃদয় নিয়েও এই পৃথিবীকে ত্যাগ না করে এরই উপর চলে বেড়াতে গেলে, একঘেয়েমি, নোংরামি ও নিষ্ঠুরতা ভেদ করে প্রাণময় সৃষ্টিশীল সত্তা কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তা লক্ষ করতে গেলে এবং মানুষের আক্রোশ ও অমর্যাদার জন্য আসলে কারা দায়ী, তা আবিষ্কার করতে চাইলে" মানুষ ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী গভীর আস্থা, কী অফুরন্ত আশাবাদ, এবং মর্ত্যলোক ও জনসাধারণের সঙ্গে কী গভীর সংযোগ অপরিহার্য, গর্কি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

গর্কি উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথিবীটা আসলে "অমানুষ"দের জগৎ নয়। আমরা যাদের "অমানুষ" বিবেচনা করি, তারা কেবল নিষ্পেষিত বিপর্যস্ত মানুষ; বুর্জোয়া জগৎকে সমগ্র পৃথিবী বলে ভুল করলে চলবে না; আসলে "অমানুষ" তারাই যারা মানুষকে অপমান করে, আহত করে; যারা আহত হয়, তারা নয়।

গর্কি পুরনো পৃথিবীর আমূল রূপান্তরসাধনায় তাঁর সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেছেন। "ক্লিম সামগিন", "ফোমা গোরদিয়েভ", কয়েকটি ছোটগল্প, এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী "পৃথিবীর পথে"-র মধ্যে গর্কি যৌথ সৃষ্টিশীল কর্মসাধনার অবিস্মরণীয় চিত্র রচনা করেছেন—এই ধরনের প্রয়াস মানুষের মধ্যে তার যথার্থ সত্তাকে জাগ্রত করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও যৌথ কাজের অভিজ্ঞতায় "এক বিশাল শ্রমিকবাহিনী" সৃষ্টি হয়, তারা অনুভব করে "মর্যাদা, সাহস ও বীরত্বে"র অনুপ্রেরণা।

কর্ম, প্রেম, বন্ধুত্ব ও শিল্পের সংযোগে মানুষের রূপান্তরের সম্ভাবনায় বিশ্বাস হেতুই গর্কি এই জটিল পৃথিবীকে আনন্দময় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। "এনিমিজ্", "দ ফিলিস্টীনজ্" এবং "মা"-এ গর্কি বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবচিন্তাকে দেখিয়েছিলেন এমন এক শক্তিরূপে যা মানুষের

মধ্যে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনে। বিপ্লবের আগুন, নতুন পৃথিবীর লড়াই মানুষের মন থেকে তার ফিলিস্‌টীন সংস্কারের বিষ, পুঁজিবাদী অর্থগৃধ্নুরা যেসব নেশায় তাকে বুঁদ করেছে, তা থেকেও তাকে মুক্ত করে। মানুষ পৃথিবীকে বদলাতে গিয়ে নিজেকেও বদলায়। পশ্চিমের মহান মানবিকবাদীরা যেসব "ভয়ংকর সমস্যা"র ভাবনায় পীড়িত, প্রোলেতারিয় বলশেভিক মানবিকবাদে গর্কি তার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন,।

গর্কির মৃত্যুর পর একশো বছর কেটে গেছে। গর্কির আদর্শ ও কীর্তির প্রভাব, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পরবর্তীকালে বিশ্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে অপরিবর্তনীয় রূপান্তরপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তারই অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গেছে।

ঈষৎ সংক্ষেপিত। এ. পি. এন

ম্যাকসিম গর্কি

আনাতোলি লুনাচারস্কি

গর্কি নাকি নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখক—গর্কির সংগীত কান পেতে শুনলে এই ভাসাভাসা তত্ত্ব নাকচ না করে পারা যায় না এবং তা করতে গিয়ে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি গর্কির রচনার ছত্রে ছত্রে স্পন্দিত যে অদম্য দুরন্ত রামধনু-রঙা জীবনের আনন্দ তা কখনই নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর হতে পারে না। মধ্যশ্রেণীর পাপগুলির প্রতি তাঁর নির্মম ঘৃণা, মানুষের পরে, তার পেশল সংস্কৃতি, তার আসন্ন জয়ের পরে তাঁর সুগভীর বিশ্বাস কখনই মধ্যশ্রেণীসুলভ নয়, মধ্যবিত্তসুলভ নয় তাঁর শৌর্যের বলিষ্ঠ আহ্বান, আসন্ন বিপ্লবের সংকেতবাহী তাঁর ঝড়ের পাখি। এর কোন কিছুই নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর নয়, সবকিছুই প্রলেতারিয়েতের।

যে সামাজিক পরিবর্তন তলস্তয়ের জনক—পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমশিল্পের দ্রুত অগ্রগতির ফলে পুরনো রুশিয়ার ধ্বংস, সে পরিবর্তন ছিল একপেশে এবং সংশোধনের অতীত। তলস্তয় ভাবাদর্শগতভাবে পলায়ন করেন ইতিহাসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নিজের শ্রেণীর কাছ থেকে, আশ্রয় নেন কৃষকসমাজে। কিন্তু কৃষকসমাজেরই বা পরিত্রাণের পথ কোথায়? দরিদ্র কৃষকের পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে অনেক পরে এবং একমাত্র বিজয়ী প্রলেতারিয়েতই তাকে পথ দেখাতে পারবে।

সংগতভাবেই বলা যেতে পারে তলস্তয়ের কাছে এ-ধরনের প্রলেতারিয়েতের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রগতিশীল কৃষকসমাজের প্রতিনিধি বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা এবং তাঁদের মহান নেতা চের্নিশেভস্কি দূর অবছায়ে উদিত হন—তলস্তয়ের কাছে ম্লান এবং বিরস সিলুয়েট রূপে। তিনি তাদের মনে করতেন তারাও ঐ শয়তানি শহরের সন্ততি, উন্মাদেরা হিংসার সাহায্যে হিংসার নিবৃত্তি ঘটাতে চায়, অগ্রসরমান ভুয়া সভ্যতার নারকীয় বিশৃঙ্খলাকে

চায় আরও বাড়িয়ে তুলতে, লুণ্ঠন ও বণ্টনের স্থূল প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ভুয়া ইন্দ্রিয়সুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে চায় সরল মানুষগুলিকে।

অন্যদিকে যে পরিবর্তনের সৃষ্টি ম্যাকসিম গর্কি তা ছিল দ্বৈত চরিত্রের। এবং তাতে ছিল পথের সংকেতও।

পুঁজির জগদ্দল পাষাণ-ভার যদিও তখন দেশের উপর নেমে এসেছে কিন্তু তখনই তাতে ফাটল ধরেছে, ফুটে উঠেছে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। এমনকি সাহিত্যেও পুঁজিতন্ত্রের জয়গান প্রতিফলিত হয় নি, যতটা হয়েছে গোঙানি ও বিলাপ। বাবোরিকিনের মত দক্ষ ও পর্যবেক্ষণশীল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের জীবনের চিত্রকরেরাও তাঁদের বর্ণনা শুরু করেছেন পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি এবং দ্বিধা ও সংশয় দিয়ে।

সারা রুশ সাহিত্যে এমন একজনও লেখক খুঁজে পাওয়া যাবে না যাকে বলা যায় পুঁজিতন্ত্রের চারণ—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অন্যদিকে আবার পুঁজিতন্ত্রের ছিল একটা প্রলেতারিয় স্তরও, সমগ্র সমাজকেই ইতিহাস পরে এর উপর স্থাপন করেছে।

যুগের প্রধান সাহিত্যরথী ম্যাকসিম গর্কির কাছে অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পুঁজিতন্ত্রের আর-একটি দিক। নিপীড়িত নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর তালছুট করুণ বিলাপের কথা আমরা আগেই বলেছি—কৃষকসমাজের মত তাদেরও হাড়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল পুঁজিতন্ত্রের রথচক্র। এই উন্মাদ, স্বতঃস্ফূর্ত তালভঙ্গ থেকেই গর্কির দীপ্ত ক্রোধের জন্ম।

হ্যাঁ, গর্কি সাহিত্যের জগতে এসেছিলেন কৃষকের জুতো, কৃষকের জামা পরে, ক্ষয়রোগগ্রস্ত কিন্তু অমিত শক্তিধর, দুঃখের পাত্র থেকে আকণ্ঠ পান করেছেন তবু সুখের প্রয়াসী; তিনি সাময়িকপত্রের সূর্যস্নাত আপিসগুলিতে এলেন—তাঁর গ্রামের কুঁড়ের তুলনায় যেগুলি সালোঁর মত অভিজাত—"ছুঁচোদের" অন্ধ, নোংরা, ভয়াবহ জীবন সম্পর্কে পূর্ণ ও ভয়ংকর সত্য বলতে। এইটেই ছিল গর্কির মহা লক্ষ্য, তাঁর মহান অভিযোগপত্র। তাঁর তীব্র, শ্লেষাত্মক, নির্মম বাস্তববাদের উৎস।

নিপীড়িত মানুষের মুখে লুকা (লোয়ার ডেপথস্) সাত-তাড়াতাড়ি মিথ্যার আফিম গুঁজে দেয়—এই কারণে গর্কির চোখে সে নিন্দার্হ। গরীব মানুষদের গর্কি ভাই বলে মনে করতেন তাই তাদের কাছে তিনি মিথ্যে বলতে চাইতেন না—মিথ্যেবাদী শিল্পের মত। গর্কির অপাপবিদ্ধ সততার

কাছে এই মিথ্যা সান্ত্বনা, এই "গৌরবান্বিত প্রবঞ্চনা" অনেক সময় যা তাঁর কলমের ডগায় আসত—ছিল সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এই সততা, এই সাহস তাঁর গোড়ার দিককার রচনায় ছিল নতুন ধরনের এক সংগীতের প্রতিভাস ঃ অগ্রগামী প্রলেতারিয়েতের যোদ্ধবাহিনীর কুচকাওয়াজের সংগীত।

শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও সামাজিক চেতনার প্রসারের ফলে বাতাসে যদি বসন্ত আর বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ না থাকত তাহলে কে বলতে পারে যে গর্কিও চরমতম নিরাশাবাদের শিকার হতেন না? আমরা তো জানিই নারদনিকিদের রগচটা আদর্শবাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। আর তাঁর ছদ্মনাম গর্কির মধ্যেও কি নিরাশাবাদী নীতিপ্রচারের হুমকি ছিল না?

তবে একটা কথা নিশ্চিত করে বলা যায় আইকন-প্রদীপের এবং নানা বিচিত্র ধর্মীয় কল্পনার যত কালিঝুলিই মধ্যবিত্তের বিবরে জমা হোক না কেন—গর্কি তাঁর জীবনের একাংশ এই বিবরে কাটিয়েছেন—অতি দ্রুত সকল ধরনের "ঈশ্বরের" ছোঁয়াচ থেকে মুক্তি অর্জন করেছিলেন।

কৃষ্ণ হতাশার অবতাররূপে হতভাগ্য মানবজাতিকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন গর্কিকে এইরূপে কল্পনা করা বরং সহজ কিন্তু তলস্তয় ধরনের সাধুসন্তরূপে বরাভয়ের ভঙ্গীতে তিনি হাত উঁচু করে আছেন, এক মাথা চুলের পিছনে জ্যোতির্মণ্ডল—এ ভাবাও যায় না।

গভীর, কিছুটা চাপা গলায় রুশ পাঠকের কাছে গর্কি গরীবের ভয়াবহ জীবনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর গল্পগুলি এত তীব্র ছিল যে এক-এক সময় তা অসহনীয় মনে হত কিন্তু তেতো মনে হত না কখনও। কেন? কেননা গর্কির পকেট বোঝাই ছিল সোনালা, লাল, ময়ূরকণ্ঠী রঙের নানা ছবি আর রূপকথা আর তার ছত্রে ছত্রে মিশে ছিল, কিছুটা হয়তো ছেলেমানুষি, রোমান্টিকতা এবং বীরবাদ। এমনকি সেই আশ্চর্য বাস্তববাদী চেলকাশেও মানুষের আত্মমর্যাদার সোনালী, লাল, ঘননীল চেলকাশের চুলভর্তি মাথা, ব্রোঞ্জের মত বুক আর উলিডুলি পোশাককে যেন আলোকিত করে রাখে।

গর্কি অচিরেই রূপকথার ময়ূরপুচ্ছ ত্যাগ করলেন, কিন্তু সাহসিক প্রতিবাদ ক্রমশই জীবনের সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিল আর এইভাবেই সৃষ্টি হল গর্কির স্বরগ্রাম, সুরসংগতি, ঐকতান।

লেভ তলস্তয় সাহসী প্রতিবাদকে তাঁর উপজীব্য করতে পারেন নি—

তাঁর অভিজাতচক্র থেকে বা ইয়াসনায়া পলিয়ানার কৃষকদের কাছ থেকে আশার আলোকে দীপ্ত সংগ্রামের আহ্বান আসে নি।

আর সেই ভয়াবহ কৃষ্ণতা, যা ছিল তখনকার দিনের রুশিয়া তার কোথাও কোন শিল্পী সেই প্রতিবাদকে তাঁর উপজীব্য করতে পারেন নি। 'কি করা যায় ?'—১৮৬০এর যুগের বুদ্ধিবাদী উপন্যাসগুলি এই প্রশ্নের চারপাশে ঘুরে বেরিয়েছে। ভবিষ্যতের ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি হয়তো তাতে ফুটে উঠেছে, কিন্তু কর্মের আহ্বান অপেক্ষা পূর্বাশঙ্কার স্মরণচিহ্নই ছিল প্রবল।

ম্যাকসিম গর্কির সংগৃহীত রচনাবলী—এই সাধারণ শিরোনামায় প্রকাশিত ৩০টি খণ্ডের লেখক আমাদেরই পুরনো বন্ধু আলেকসেই ম্যাকসিমোভিচ পেশকভ।

কিন্তু এই এতগুলি পৃষ্ঠা যে অগ্নিবর্ণ কালিতে তিনি লিখেছেন তা এমনকি তাঁর হৃদয়েও ছিল না। তিনি তাঁর কলম ডুবিয়ে নিয়েছিলেন জীবনের ঝর্ণায়, বিপ্লবের আসন্ন জোয়ার ছিল যার উৎস।

তাই দেখতে পাই সতীর্থ লেখক, মহান, প্রাণবন্ত, একান্তপ্রিয় আলেকসেই পেশকভের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েতের বিশাল মূর্তি—তার সবল বাহু দুটি সেই মানুষটির কাঁধে আলতোভাবে ন্যস্ত, যিনি হয়ে উঠেছেন তার মুখপাত্র।···

···এবারে স্মরণ করুন গর্কির প্রকৃতি-বর্ণনা।

এই প্রকৃতি রোরুদ্যমান, দামাল, মানুষকে তা আঘাত করে, বেদনা দেয় তবু যেন এই অনুভূতিই শেষ কথা নয়। মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকে প্রকৃতির রাজকীয় মহিমার এক ছবি। তুর্গেনেভের কথা মনে রেখেও বলতে পারি, দৃশ্যচিত্রের এ অতুলনীয় বৈচিত্র্য রুশ সাহিত্যে অনন্য।

গর্কি সত্যই দৃশ্যচিত্রের এক মহাশিল্পী, আরও বড় কথা, দৃশ্যচিত্র-প্রেমিক। প্রথমে আকাশের দিকে না তাকিয়ে, সেখানে সূর্য চন্দ্র তারা আকাশের রঙের থালায় ক্ষণে ক্ষণে মেঘের কী মায়া রচনা করছে তা লক্ষ না করে কোন মানুষের বর্ণনা করা, কোন গল্প বা উপন্যাসের অধ্যায় শুরু করা তাঁর পক্ষে কঠিন হত।

গর্কির রচনায় কত না সমুদ্র, কত না পর্বত, কত বনস্থলী আর স্তেপভূমি, কত বাগান, প্রকৃতির কত সংগোপন কুঠরিরই না দেখা পাই আমরা। আর তার বর্ণনায় কী আশ্চর্য সব শব্দই না তিনি ব্যবহার করেন। তিনি

ছবি আঁকেন বিষয়মুখ শিল্পীর মত: কখনও ম্যামের মত রঙগুলো তিনি ভেঙে দেন তাঁর আশ্চর্য বিশ্লেষণশীল চোখ আর তাঁর অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে, আবার কখনও বা সংশ্লেষকের মত একটিমাত্র খোদাই করা কথার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন বিরাট এক দৃশ্যের আভাস। কিন্তু তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতেন কবি হিসেবেও। সূর্যাস্ত কি বিষণ্ণ হয়? বনস্থলী কি চিন্তামগ্নভাবে ফিসফিস করতে পারে? সমুদ্র হাসে? —আমরা বিশ্বাস না করতে পারি—কী এসে যায় তাতে! পারে, সব পারে। এক মানুষ যদি শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হয় (কখনও হবে না) মাত্র তখনই প্রকৃতিতে আপন আবেগের আশ্চর্য সূক্ষ্ম প্রতিফলন সে দেখতে পাবে না।

তাঁর মানবিক নাটকের জন্য প্রকৃতির রাজসিক, সুন্দর আবহসংগীত রচনায় গর্কি অত্যন্ত সুদক্ষভাবে মানবিক আবেগ আর প্রকৃতির অতি স্পর্শকাতর উপমা ব্যবহার করেন, এত সূক্ষ্ম যে প্রায় ধরাই যায় না।

আমার কথা যাঁদের বিশ্বাসযোগ্য মনে না হবে, যাঁরা মনে করবেন আমি গর্কির প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করছি তাঁরা ক্লিম সামগিনের যে-কোন খণ্ড খুলে পড়ে দেখতে পারেন কীভাবে মানবিক নাট্যের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা হয়েছে।

কিন্তু গর্কি কেন প্রকৃতিবর্ণনায় এত পৃষ্ঠা অপচয় করেন? এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় গর্কি প্রলেতারিয় লেখক? প্রকৃতির কতটুকু দেখতে পায় একজন শ্রমিক? কারখানার ইঁটের দেয়াল কি প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে না? শ্রমিকের ব্যারাক, শ্রমিকের বসতি থেকে কি প্রকৃতি নির্বাসিত নয়?...

আমরা আগেই বলেছি প্রকৃতি মানুষকে বলে বাঁচতে, সংগ্রাম করতে, জীবন উপভোগ করতে, বংশবৃদ্ধি করতে কিন্তু আরও বিচক্ষণভাবে, অর্থাৎ পশুজগতের চেয়ে আরও জোরের সঙ্গে, আরও সচেতনভাবে।

প্রলেতারিয়েত বলে: হ্যাঁ, প্রকৃতি মা, আমাদের মহান, আশ্চর্য, নির্মম, অন্ধ মা, তুমিই ঠিক; তোমার পৃথিবী, তোমার জীবনের ধারা উত্তম। বিচক্ষণ ঐক্যবদ্ধ মানবজাতির হাতে, যে সর্বজনীন কমিউন আমরা গড়ে তুলব তার হাতে, তা হয়ে উঠবে সর্বোত্তম। কী করে তা গড়তে হয় তা আমরা জানি এবং অবশ্যই আমরা তা গড়ব। আর তখন ভবিষ্যতের নতুন ও আশ্চর্য মানুষের কাছে প্রকৃতি সত্যই হয়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য।

গর্কি বলেন, 'সেই কারণেই তো প্রকৃতিকে আমি ভালোবাসি।'…

গর্কি মানুষকে তার সবকিছু মিলিয়ে ভালোবাসতেন। সাটিন যখন বলে: "মানুষ—কী একটা গর্বের সুর লেগে থাকে কথাটাতে", তখন সে গর্কির কণ্ঠস্বরেই কথা বলে।

গর্কি জানতেন মানুষ নীচ হতে পারে আর এই মানুষকে তিনি ঘৃণাও করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন এই মানুষ অজ্ঞান, মূর্খ, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল, মানবজীবনের সুন্দর তরুর ক্ষত বিশেষ।

তিনি এ-ও জানতেন, সত্যিকারের মহৎ মানুষ,—হৃদয় যার শুদ্ধ নির্মল, যিনি সাহসী এবং বিচক্ষণ—এখনও বিরলসংখ্য, দোষ-ত্রুটিমুক্ত মানুষ নেই বললেই চলে। কিন্তু তাই বলে সতীর্থ মানুষকে ভালোবাসতে, প্রকৃত আবেগ নিয়ে ভালোবাসতে, মানুষের উপর আস্থা রাখতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। আর এই আস্থার উৎস ছিল জ্ঞান।

এবারে আসা যাক প্রগতি বিষয়ে তলস্তয় ও গর্কির মনোভঙ্গীর আলোচনায়।

এই ব্যাপারে দুজন লেখকের মধ্যে অনেক মিল আছে। তলস্তয় তাঁর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন জাতিপ্রেম, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক অতীতকে এবং তার তলানীকে।

আর গর্কি, বলা যায়, জন্মেই ছিলেন এসবের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা নিয়ে। পুঁজিতন্ত্রের প্রতি তলস্তয়ের ঘৃণাও ছিল মহৎ ঘৃণা, ইওরোপীয় সংস্কৃতির চোখ-ধাঁধাঁনো উজ্জ্বলতা তাঁকে প্রতারিত করতে পারে নি। কিন্তু ইওরোপ থেকে ঘুরে এসে, শ্বেতপাথর আর গালচের নিচে কালো মিথ্যাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে রাগে যেন ফেটে পড়েছিলেন তিনি।

গর্কিও তাঁর প্রথম যৌবনেই হয়ে ওঠেন পুঁজিতন্ত্রের পয়লা নম্বরের শত্রু। আমেরিকার পীত দানব গর্কিকেও বোকা বানাতে পারে নি, বুর্জোয়া মোহিনী ফ্রান্সের মুখে রক্ত এবং পিত্ত বমি করে দিয়েছিলেন তিনি।

হীন শহুরে মানুষদের এবং কৃষকদেরও অনেক পরিমাণে, কাপুরুষতা, বেহেড মাতলামি, হীন শঠতা, মাকড়সার মত নিষ্ঠুরতার সমস্তরকম প্রকাশের সঙ্গেই তলস্তয়ের পরিচয় ছিল।

এবং গর্কিও, ভীত-সন্ত্রস্ত কৌতূহলতাড়িত হয়ে পেটিবুর্জোয়াদের বিবর খুঁড়ে সেখানকার আবর্জনাকে আলোতে নিয়ে আসতে চেয়েছেন।

কিন্তু তলস্তয় এখানেই গণ্ডি এঁকে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন : পুরনো চাষীর মুখাবয়বে যেসব মালিন্য জমা হয়েছিল তা মোচন করে পূর্বপুরুষদের ঋষিপ্রতিমা পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি। ঋষিতুল্য আকিম, তাদের বাচাল বক্তব্যহীনতা, রূপকথার চরিত্রের প্যাট্রিয়ার্ক মানুষকে যে দেবে "মুরগীর ডিমের মত বড়ো শস্যদানা।"

ঋষিতুল্য কৃষকের অতিকথার উপর, প্রতিটি মুঝিকের মধ্যে লুকোন আছে এক-একজন ঋষি প্রতি মুহূর্তে যে মাথা তুলবার চেষ্টা করছে—এই অতিকথার উপর তলস্তয় তাঁর অতীন্দ্রিয় বাঁধাকপির স্বর্গলোক গড়ে তুলেছেন।

গর্কিও প্রায় ছোট্ট মানুষটিকে ঘিরে গণ্ডি টানতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে খুঁজতেন বড়ো মানুষ, গর্বিত মানুষকে, আকরিকের মধ্যে খুঁজতেন স্বর্ণপিণ্ড। গর্কির বিশ্বাস ছিল, জীবনের স্রোত অপ্রয়োজন বোধে যাদের ধুয়ে এনে তীরে জমা করেছে, যারা দলছুট, একলসেঁড়ে, উদ্দাম প্রতিবাদী, সম্পত্তি বা নীতির বাঁধনে যারা বাঁধা পড়ে নি, সমাজবিরোধী, সহজাত নৈরাজ্যবাদী—তাদের মধ্যেই এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এখানে বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকেন নি গর্কি। গর্কি স্বাভাবিকভাবেই মিশে গিয়েছিলেন প্রলেতারিয়েত ও তার অগ্রণী অংশ বলশেভিকদের সঙ্গে।

এই মিলনের সাক্ষ্য বহন করছে গর্কির অনেক অনন্যসাধারণ রচনা ; যার মধ্যে উল্লেখ্য 'শত্রুরা', 'মা' 'ক্লিম সামগিনের জীবন' ইত্যাদি।

মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তলস্তয় ও গর্কির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কারণ এইখানেই নিহিত।

বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও বুর্জোয়া আর্টের বিরুদ্ধে তলস্তয়ের বিষোদ্গারের মধ্যে নিঃসন্দেহেই কিছু সত্য আছে কিন্তু তিনি স্নানের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও ফেলে দিয়েছেন। আর সে শিশু, শাসকশ্রেণীর হাতে যত খারাপভাবেই মানুষ হয়ে থাক না কেন, যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ ও কর্মক্ষম।

সেকেলে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষেরা বিজ্ঞান ও শিল্পকে সন্দেহের চোখে দেখত। প্রযুক্তিগত প্রগতির কোন দাম ছিল না তাদের কাছে। তলস্তয় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। প্রলেতারিয়েত কিন্তু উৎসাহ-ভরে একে গ্রহণ করে এবং নিজের করে নেয়। তারা জানে একমাত্র সমাজতন্ত্রের আমলেই বিজ্ঞানের প্রকৃত বিকাশ ঘটে, সংস্কৃতির প্রস্ফুরণ হয়। গর্কিও একথা জানতেন।

ম্যাকসিম গর্কি ও ভারত

পিয়তর বারান্নিকোভ

(ম্যাকসিম গর্কির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে)

রুশিয়ার মহান সাহিত্যিক ম্যাকসিম গর্কি ও ভারতের মধ্যে ছিল অসংখ্য বহুবিধ বন্ধনের যোগাযোগ। এই যোগাযোগের অন্যতম হল প্রায় সবকটা ভারতীয় ভাষায় গর্কির রচনার অনুবাদ। আমার পিতা আকাদেমিশিয়ান আলেকসেই বারান্নিকোভ তাঁর রচনায় এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে "রুশ সাহিত্য সম্পর্কে ভারতীয়গণ" (১৯৪৮), "গর্কি ও ভারতীয় সাহিত্য" (১৯৪০) "ভারতে এ. এম. গর্কির রচনা" (১৯৫১) প্রভৃতি। সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা সংক্রান্ত আলেকসেই বারান্নিকোভের লেখা 'ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব' নামে যে-বইটি ১৯৫৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় সেই বইয়ের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধগুলি রয়েছে। বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞা ভেরা নোভিকোভা বাংলায় গর্কির রচনার অনুবাদের উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫১ সালে "লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিনে" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

গর্কির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের অন্য একটি বন্ধনের কথা আমি এ প্রবন্ধে আলোচনা করব। বিভিন্ন ভারতীয় নেতা ও সংগঠনের সঙ্গে এই বিখ্যাত রুশ লেখকের যোগাযোগের কথাই আমার আলোচ্য। সেই সঙ্গে গর্কির রচনাবলীতে প্রকাশিত, তাঁর লেখা যেসব প্রবন্ধ ও চিঠির মধ্য দিয়ে ভারত সম্পর্কে তাঁর যে-দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কেও আমি কিছু বলব।

ভারত সম্পর্কে সর্বদাই গর্কির আগ্রহ ছিল। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ভারতের বিখ্যাত সন্তান মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল। বহু ভারতীয় নেতার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ঘটেছে। ১৯১২ সালে সাংবাদিক ও অন্যতম ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার সহযোগী বি. আর. কামাকে একটি চিঠিতে গর্কি লেখেন ঃ

" 'ভারতের নারী, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা' এই বিষয়ের উপর আপনি রুশ পত্রিকার জন্য কেন একটি প্রবন্ধ লেখেন না ? গঙ্গার তীরে মহান ভারতের গণতন্ত্রবাদী এবং নারীরা কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে এবং সংগ্রাম করে চলেছে এ সম্পর্কে রুশের গণতন্ত্র ও নারীসমাজকে একটি প্রবন্ধে যদি আপনি জানান তাহলে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।"

চিঠির উত্তরে ১৯১২ সালের ৩১ অক্টোবর বি. আর. কামা লেখেন :

"আমার সমগ্র জীবনই আমার দেশ ও তার লড়াইয়ের কাজে নিবেদিত। আমার দেশের আদর্শ সম্বন্ধে যদি কোন প্রবন্ধ লিখতে পারি তার জন্য অর্থাৎ আপনার অনুরোধ রক্ষার জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করব।" এই সঙ্গে তিনি গর্কিকে এ-ও জানান যে ভারতের অন্যতম বিপ্লবী ও জননেতা ভি. ডি. সাভারকরের লেখা একটি বই তিনি গর্কিকে পাঠিয়েছেন।

কৃষ্ণবর্মার সঙ্গেও গর্কির পত্রালাপ ছিল। কৃষ্ণবর্মাকে বৃটিশ উপনিবেশ-কারীরা ইংলণ্ডে নির্বাসিত করেছিলেন। ফ্রান্সে তিনি 'ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল বিদেশে ভারতীয় দেশ-প্রেমিকদের মুখপত্র। কৃষ্ণবর্মাকে লিখিত একটি চিঠিতে গর্কি তাঁকে রুশ পাঠকদের জন্য ভারত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনার অনুরোধ করেন। জবাবে ১৯১২ সালের ২৮ অক্টোবর কৃষ্ণবর্মা লেখেন :

"একথা জেনে আমি অত্যন্ত খুশি যে, ইওরোপে এমন কিছু লোকও আছেন যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সত্যিই আন্তরিকভাবে ভালবাসেন এবং শুধু নিজেদের স্বাধীনতাই নয়, বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতাও তাঁদের একান্তকাম্য।" এরপর কৃষ্ণবর্মা জানিয়েছেন যে তাঁর কর্মব্যস্ততার জন্যই তিনি রুশ পত্রিকায় লেখা পাঠাতে পারছেন না। তিনি গর্কিকে তাঁর পত্রিকার একটি কপি পাঠান এবং সেই সঙ্গে একটি চিঠিতে জানান :

"আপনি এই পত্রিকার তথ্যের ভিত্তিতে নিজের মত করে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন এবং আমার মতামত ব্যক্ত করে এমন জায়গায় আমার নামও উল্লেখ করতে পারেন।" এর পরে আমরা দেখব কৃষ্ণবর্মার এই প্রস্তাব গর্কি কাজে লাগিয়েছিলেন।

পাঞ্জাবের 'সাহিত্য লীগে'র সম্পাদক চৌধুরীর কাছ থেকে গর্কি দুটি চিঠি পান। উভয় চিঠিই লেখা ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে। এই চিঠিগুলিতে চৌধুরী পাঞ্জাবে 'সাহিত্য লীগ' সংগঠন সম্পর্কে গর্কিকে জানান। এই প্রসঙ্গে লীগের পক্ষ থেকে তিনি লেখেন :

"আমরা আপনার কাছে একটি বাণী চাইবার দুঃসাহস দেখাচ্ছি। আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবই এবং সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শ এমন এক আদর্শ যার জন্য সংগ্রাম করা যায়, মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করা যায়—এই মর্মে আপনি আমাদের একটি বাণী পাঠান। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল—কোন বৃহৎ কাজ আরম্ভের পূর্বে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর (শিক্ষক) আশীর্বাদ চাইতাম। এক্ষেত্রেও সেই একই অনুভূতি আমাদের পরিচালিত করছে। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব গুরুদের (শিক্ষক) অন্যতম একজন আপনি।"

১৯৩১ সালে ভারতের খ্যাতনামা মনীষী, সাহিত্য-সমালোচক এবং লেখক আর. জি. শাহনি গর্কিকে লেখেন :

"আমার ভারত ত্যাগের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি আমারই মত আপনার প্রতিভার আন্তরিক গুণগ্রাহী, তিনি আমার "পূবদেশের জনগণের দৃষ্টিতে সেক্সপিয়র" এই রচনাটি সম্পর্কে আপনার পরামর্শ নেবার জন্য উপদেশ দেন। এটি সোবোর্নে আমার গবেষণার বিষয় ছিল এবং অনুমোদনও লাভ করেছে।

"রোমাঁ রোলাঁ, আঁদ্রে মারোয়া, বেনেদেতো ক্রোচে, হ্যাভলক এলিস এবং এডোয়ার্ড গার্নেট আমার লেখাটি পড়ে অনুমোদন করেছেন। আপনার মত একজন মনীষী যদি আমার বইয়ের ভূমিকা লেখেন তা আমার কাছে হবে অত্যন্ত আনন্দের। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।"

সেদিনের একজন তরুণ লেখক রাজা রাও ১৯৩৪ সালে গর্কিকে লেখেন যে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রকাশকরা তাঁর রচনা প্রকাশে অসম্মতি জানিয়েছেন ; রাজা রাও গর্কিকে তাই লেখেন "আপনি যদি মস্কোতে আমার গল্পগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব। এই সুযোগে আপনার রচনার ক্ষমতা ও মানবতাবোধের জন্য আমার গভীর

ভারতীয় ভাষায় গর্কির রচনাবলী

প্রশংসা জানাতে চাই। আর জানাতে চাই যে, 'জাঁ ক্রিস্তফে'র মতই আপনার 'মা' আমাকে লেখক হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে আমি ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরম বামপন্থী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং রুশিয়া ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য আন্তরিক কামনা করি।"

ম্যাকসিম গর্কি ও ভারতীয় নেতাদের মধ্যে পত্রালাপের এ মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। এগুলি পড়লে বোঝা যায় যে ভারতীয়রা শুধু গর্কিকে জানতেন তাই নয়, তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং গর্কির জন্য ছিল তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় নেতাদের কাছে লেখা গর্কির চিঠি আমরা পাই নি। হয়তো সেসব চিঠি ভারতে সংরক্ষিত আছে এবং বিশ্বের জনগণের কাছে তা নিশ্চয়ই প্রকাশ করা হবে।

১৯২৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি রোমাঁ রোলাঁর কাছে লেখা গর্কির একটি চিঠিতে ভারতীয় বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। গর্কি এ-চিঠিতে লিখেছেন :

"আপনার প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটি ছাড়াও গান্ধীর উপর লেখা আপনার প্রবন্ধটি কেন আমাদের দিচ্ছেন না? এটির জন্য আপনাকে আমি বিশেষ-

ভাবে অনুরোধ করছি। আমরা তাঁর সম্পর্কে মাত্র খবরের কাগজ থেকে যতটুকু জানা যায় তাই জানি।"

গান্ধী সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর লেখা প্রবন্ধ গর্কি পেয়েছিলেন। 'বেসেদা' (বক্তৃতা) পত্রিকার ১ এবং ২ সংখ্যায় বার্লিনে ১৯২৩ সালে লেখাটি প্রকাশিতও হয়েছিল। ঐ সময়ে গর্কি চিকিৎসার্থ বিদেশে বাস করছিলেন। ১৯২৩ সালের ৬ অগস্ট বিদেশে থেকে গর্কি রোমাঁ রোলাঁকে লেখেন :

"আপনার লেখা 'মহাত্মা গান্ধী' মস্কোতে 'ক্রাসনায়া নোভ (লাল সংবাদ)' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।"

১৯২৪ সালে রোমাঁ রোলাঁর বই "মহাত্মা গান্ধী" লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

ভারত সম্পর্কে লেখা অনেক বই গর্কি পড়েছেন। বিশেষ করে বিখ্যাত রুশ ভারতবিদ সার্গেই ওলডেনবার্গের লেখা তিনি পড়েছেন। গর্কি 'সম্পাদকের চিঠি'তে তাঁর নাম উল্লেখ করে লেখেন, "আমাদের প্রাচ্য-বিদেরা ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।" ১৯২৪ সালে আই. কালিন্নিকোভকে লেখা এক চিঠিতে গর্কি জানান যে প্রকাশক গ্রাঝেবিন "ইতিমধ্যেই এস. এফ. ওলডেনবার্গ অনূদিত ভারতীয় গল্পের বইটি প্রকাশ করেছেন।"

ইংরেজ লেখকদের লেখা ভারত-বিষয়ে গ্রন্থ সমূহের সঙ্গেও গর্কির সম্যক পরিচয় ছিল। বিশেষ করে আলান কার্টহিলের লেখা "একটি হৃত রাজ্য— ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর একটি সমীক্ষা" বইটি গর্কি পড়েছিলেন। এই বইয়ের রুশ অনুবাদ ১৯২৫ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। "মেয়েদের সম্বন্ধে" নামে এক প্রবন্ধে এই বইটি সম্বন্ধে গর্কি লেখেন :

"আলান কার্টহিল তাঁর 'একটি হৃত রাজ্য' বইয়ে এই সর্বনাশের অন্যতম একটি কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে ভারতবাসীরা নিঃসন্দেহ।"

এখানে 'পাশ্চাত্ত্য' শব্দটির বদলে হওয়া উচিত 'ইংরেজ' এবং 'নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা' শব্দটির বদলে হওয়া উচিত 'নপুংসকতা'।

একই প্রবন্ধে গর্কি আর-এক জায়গায় বলছেন :

"একথা পরিষ্কার যে ইংরেজ সভ্যতার প্রতি ভারতীয়দের সংশয়বাদী

মনোভাব ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে। সেই একই কার্টহিল প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন :

'মানুষ যেমন ক্রীতদাস নয়, ঈশ্বরও নয় অথবা রাজাও নয় তেমনি মানুষ কোন ঐশ্বরিক অথবা অপরিবর্তনীয় বিধানের দাসও নয়'।

"এ ধরনের কথা থেকে বোঝা যায়, একদা যা শক্তিশালী ছিল সেই পুরাতন অবস্থা হার মানছে। ভারতবাসীরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রশাসকের লেখা এমন বই পড়ে নিশ্চয় প্রচুর আনন্দ পায়।"

১৯১২ সালে সেণ্ট পিতার্সবার্গের "সোভরেমেন্নিক" (সমকালীন) পত্রিকায় প্রকাশিত গর্কির প্রবন্ধ "বিদেশী জীবনের বিবরণ" প্রবন্ধে গর্কি সম্পূর্ণ ভারতের কথা আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণবর্মা প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতেই গর্কির এই রচনা।

প্রবন্ধের গোড়াতেই গর্কি পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন : "চেয়ে দেখুন, ইংলণ্ডের নিষ্ঠুর অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন কী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।"

"যে সংশয়ের মেঘ এতদিন দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল" ভাইসরয়ের সফর সেই অন্ধকার দূর করে "ভারতের জনগণের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষার নতুন মনোভাব জাগিয়েছে"—ঔপনিবেশিকদের এই কপট বিবৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে গর্কি লিখেছেন, "ভাইসরয় যাওয়ার দুঘণ্টা আগে কেউ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিপত্র ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না" এই ছিল হুকুম। গর্কি বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন "যে বিশ্বাসের মনোভাব" রক্ষা করতে পুলিশী ব্যবস্থার সাহায্যের দরকার হয়, সেই মনোভাব ভাল নয়।

"ভারতের সেই কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে যে-কণ্ঠস্বর বলছে ভারতবাসীকে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেবার সময় এসেছে এবং গঙ্গার তীরে ইংরেজ শাসনের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।"

তারপর এই রুশ সাহিত্যিক লিখছেন, "এই শাসনের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে জাতীয় নেতা সাভারকর যেভাবে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছেন তার মধ্যে দিয়ে। সকলেই জানে গোপনে তাঁর বিচার সম্পন্ন হয়েছে; সেই বিচারের সংবাদ পর্যন্ত ছাপা নিষেধ। তাঁকে ৪৮ বছরের

কারাদণ্ড দেওয়া হয়—অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাঁর কারাবাস। বছরে একবার মাত্র তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়।"

গর্কি লিখেছেন যে রাজা জর্জের অভিষেক উৎসবে বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় "স্বাতন্ত্র্য দেখান এবং তার ফলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সংবাদপত্র-সমূহ স্বাতন্ত্র্য, বাচালতা ইত্যাদি ভয়ংকর ভয়ংকর অভিযোগে অভিযুক্ত করে।"

গর্কি আরও বলেন, 'ডেইলি একসপ্রেস' এই প্রসঙ্গে লেখে : "বরোদা রাজ্যকে দীর্ঘকাল ধরে ভারত গবর্নমেণ্ট সন্দেহ করে আসছে বিদ্রোহের আশ্রয়দাতারূপে। স্বয়ং গায়কোয়াড় তাঁর ঘন ঘন ইওরোপ সফরকালে প্রায়ই বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।" 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' এমনকি গায়কোয়াড়কে অপসারণেরও দাবি করে। সন্ত্রস্ত মহারাজা শেষপর্যন্ত 'টাইমস' পত্রিকাকে টেলিগ্রাম করে জানাতে বাধ্য হল যে "১৯০৭ সালে কৃষ্ণবর্মা ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবার পর আর তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি।"

এইসব ঘটনার সারাংশ বিবৃতির পর গর্কি বলেন : "এই হচ্ছে ভারতীয় এবং ইংরেজদের পরস্পরের 'রাজনৈতিক' সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক কিয়ের গার্দির ভ্রমণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র। ভারতবাসীরা কী ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে এবং ইংরেজের নিপীড়ন কী স্থূল তার স্বরূপ তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন।"

ভারতে মেয়েরা যে ভয়াবহ দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন এবং যার ফলে মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে সে সম্পর্কেও গর্কি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ভারতের ১৯১১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট থেকে অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করে গর্কি এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান কমিশনের সভাপতির বক্তব্য তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন : "পুরুষ ও মেয়েদের জন্মের হার ইওরোপের জন্ম-হারের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু জন্মের পরবর্তীকালে, যেসব মেয়ে কায়িক পরিশ্রম করে জীবনধারণ করে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। সমগ্র দেশের পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারত, তার সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে গর্কির গভীর আগ্রহ ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ তাঁর

স্মরণে ছিল। ১৯৩৪ সালে প্রথম সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক কংগ্রেসে মস্কোতে গর্কি বলেন :

"আমি স্থির বিশ্বাস করি সোভিয়েত লেখকদের দ্বিতীয় কংগ্রেস পশ্চিম ও পুবের এবং···ভারতের লেখকদের দ্বারা অলংকৃত হবে। নিঃসন্দেহে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সৎ ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের সংঘ গঠনের প্রাক্-মুহূর্তে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি।"

এই মহান লেখকের স্বপ্ন ও সাধ পূর্ণ হয়েছিল : ভারতের জনগণ তাদের ঔপনিবেশিকতার বোঝা ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। যে-দেশ মানবজাতিকে তার মহত্তম সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী ম্যাকসিম গর্কিকে উপহার দিয়েছে সেই সোভিয়েতভূমিতে পদার্পণ করেছেন সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতের অসংখ্য ভারতীয় মনীষী।

ভারতে গর্কির 'মা'

বীরেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৯১৭ সালে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় মানবতার ইতিহাসে নবযুগ নিয়ে এল। ভারতের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে প্রগতিশীল চিন্তানায়কদের উপর এ বিপ্লবের প্রভাব অপরিসীম। লেখক ও পাঠক উভয়ের দৃষ্টি পড়ল রুশ সাহিত্যের উপর। বাস্তবতা এবং অবস্থার সামঞ্জস্য—রুশ উপন্যাস ও গল্পের এই দুটি বস্তু বিশেষভাবে ভারতীয় পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করল। বিশেষ সমাদর লাভ করলেন তলস্তয়, চেকভ, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি এবং গর্কি। এঁদের অনেক রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। যে-তলস্তয়কে লেনিন 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' বলতেন তাঁর সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। সম্ভবত গান্ধীজীই প্রথম ভারতীয় চিন্তানায়ক, ম্যাকসিক গর্কির মনীষা যাঁকে আকর্ষণ করে।

১৯০৫ সালে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে এক প্রবন্ধে গর্কি সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন: "...কিছুদিন আগে রুশিয়াতে একটা বিদ্রোহ ঘটে গেছে। সেই বিদ্রোহে যোগদানকারীদের অন্যতম ছিলেন গর্কি। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে গর্কির জন্ম এবং দারিদ্র্যেই লালিত হয়েছিলেন। এক মুচির সাকরেদ ছিলেন গর্কি—সেখান থেকেও তিনি বিতাড়িত হন। পরে সৈন্যদলে যোগ দেন। সৈন্যদলে থাকবার সময়ে পড়াশুনার ঝোঁক জাগে। ১৮৯২ সালে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়—প্রথম বইই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। তারপর থেকে গর্কি লিখে চলেছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে তার অধিকারের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত করা। টাকার জন্য দুশ্চিন্তা গর্কির ছিল না। তাঁর লেখার মধ্যে এত তিক্ততা ছিল যে সরকারি হোমরা-চোমরারা ভয়ংকর শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জনগণের সেবায় গর্কিকে কারাবরণ করতেও হয়েছে। জেলকে তিনি খুবই সম্মানজনক স্থান বলে মনে করতেন। শোনা যায় ইওরোপে গর্কির মত আর কোন লেখক নেই যিনি জনগণের অধিকারের জন্য এভাবে সংগ্রাম করেছেন।"

প্রথমদিকের রচনাগুলি রোমান্টিক হলেও গর্কি তার মধ্য দিয়ে নিজের মত করে রুশ জীবনের নতুন স্তরকে ফুটিয়ে তোলেন। রুশ লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই রুশিয়ায় সমাসন্ন প্রচণ্ড আলোড়নের বিরাটত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই ভারতের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর কাছে গর্কির এত সমাদর। কারণ তাঁরাও অনুভব করছিলেন রুশ দেশের মতই প্রচণ্ড একটা আলোড়ন ভারতে দেখা দেবে।

এই শতকের বিশের যুগে গর্কির ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে হিন্দি, উর্দু ও বাংলা পত্র-পত্রিকায়। ভারতীয় সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গর্কি ও রুশ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। হিন্দি ও উর্দু পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে রুশ লেখকদের রচনা দিয়ে। এই ধরনের একটি উর্দু ভাষার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেন বিখ্যাত গল্প লেখক সাদাত হাসান মানতো।

গর্কির বড় লেখার মধ্যে 'মা'ই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। 'মা' এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে গেছে। এই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। ১৯২১ সালে তার পুনর্মুদ্রণ হয়। 'মা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পাঠকেরা পেল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সন্ধান। তাদের বুঝতে সময় লাগল না যে 'মা' শুধু সামাজিক সংগ্রামের মহাকাব্যই নয়, 'মানবজাতির নতুন মানুষের' চেতনার দলিল। এই চেতনাই নিপীড়িত মানুষের ঐতিহাসিক রূপান্তরকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

হিন্দি ভাষায় তিরিশ বছর আগে 'মা' উপন্যাসের অনুবাদ করেন স্বর্গত ছবিনাথ পান্ডে। তিনি 'মা কা হৃদয়' (মায়ের হৃদয়) অনুবাদ বিখ্যাত হিন্দি গল্পলেখক স্বর্গত বিনোদশংকর ভিয়াসের অনুরোধেই করেছিলেন। এটি ছিল আক্ষরিক অনুবাদ। একই সময়ে গর্কির ছোট গল্পের একটি অনুবাদ-সংকলন প্রকাশিত হয় হিন্দিতে। তাতে ছিল 'চেলকাশ', 'ছাব্বিশ জন পুরুষ ও একটি মেয়ে', 'ওডেসার রাজপুত্র' প্রভৃতি গল্প।

কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হয় স্বর্গত চন্দ্রতাল জৌহারি কৃত 'মা'য়ের অনুবাদ। ভূমিকায় অনুবাদক লেখেন, "এ শুধু উপন্যাস নয়। পুঁজিবাদের অধীনে সমাজের দুঃখ-বেদনার এক মহাকাব্য।"

হিন্দি ঔপন্যাসিক বৃন্দাবনলাল বর্মা সম্বন্ধে গবেষণার থিসিসে সিয়া রাম-শরণ প্রসাদ গর্কির নায়িকা 'মা'য়ের সঙ্গে ইন্দোরের রানী অহল্যা বাঈয়ের গভীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বিখ্যাত হিন্দি ঔপন্যাসিক ইলাচন্দ্র যোশীর মতে "মায়ের মত হৃদয় যদি গর্কির না থাকত তাহলে তিনি 'মা'য়ের মত শক্তিশালী উপন্যাস রচনা করতে পারতেন না।" বিখ্যাত হিন্দি লেখক ড' রঙ্গ রাঘব তাঁর 'ম্যাকসিম গর্কি ও প্রগতিশীল সাহিত্য' প্রবন্ধে গর্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেছেন: "'মা' মানবতারই প্রতিমূর্তি। সমসাময়িক সমাজের এক বাস্তব রূপায়ণ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে গর্কি সম্ভব করেছেন।" 'মিল আর মজুর' ছায়াচিত্র রচনায় প্রেমচাঁদ প্রত্যক্ষভাবে গর্কির এই উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ছায়াচিত্র বৃটিশ গবর্নমেণ্ট নিষিদ্ধ করে। গর্কির প্রতি প্রেমচাঁদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ১৯৩৬ সালে গর্কির মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে প্রেমচাঁদ ভীষণ অসুস্থতা সত্ত্বেও গর্কির স্মৃতিসভায় ভাষণদান করেন।

গর্কি অসংখ্য ভারতীয় সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক পাণ্ডেয় বেচন শর্মা উগ্র তাঁর গল্প 'মানুষ'-এ যে বীরাঙ্গনা ভারতীয় বিপ্লবী মায়ের চরিত্র রচনা করেছেন তাতে গর্কির 'মা'য়ের গভীর প্রভাব রয়েছে। তিরিশের এবং চল্লিশের যুগের গোড়ার দিকে 'মা' এবং 'শ্রমিক নেতা'—এই ধরনের বিষয়বস্তু ভারতীয় সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গর্কির 'মা'য়ের প্রথম উর্দু সংস্করণ লাহোর থেকে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক মখমুর জলন্ধরি গর্কির অন্য এক উপন্যাস 'ফোমা গোর্দেয়েভ' অনুবাদের জন্য সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার পান। উর্দু ভাষায় 'মা'য়ের একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। অনুবাদ করেন মাকতাবা-শাহ-ই-রা।

চল্লিশের যুগের গোড়ার দিকে 'মজদুর' নামে 'মা'য়ের প্রথম পঞ্জাবি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নরিন্দর সিংয়ের এই অনুবাদের পর আর-একটি অনুবাদ করেন গুরুবক্স সিং।

বই আকারে গর্কির 'মা' বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন বিমল সেন (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ), বিশের যুগের গোড়ার দিকে প্রকাশিত। ১৯৩৩ সালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'মা' বাংলায় অনুবাদ করেন। উক্ত উপন্যাসের

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু। ১৯৫৪ সালে তা প্রকাশিত হয়। 'মা'য়ের উল্লিখিত সমস্ত অনুবাদেরই একাধিক সংস্করণ হয়েছে।

গর্কির 'মা'য়ের মে দিবসের দৃশ্যটি কলকাতার লিটল থিয়েটার গ্রুপের উৎপল দত্তের প্রযোজনায় বাংলায় মঞ্চস্থ হয় পঞ্চাশের যুগের গোড়ায়। দিল্লিতেও এর অভিনয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলার বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মলিনা দেবী 'মা' অবলম্বনে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং তিনি স্বয়ং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন।

শক্তিমান লেখকরূপে গর্কির প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। মনে হয় 'পথের দাবি' রচনায় শরৎচন্দ্রের উপর গর্কির 'মা'য়ের প্রভাব পড়েছিল। হিন্দি লেখক ইলাচন্দ্র যোশীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "···গর্কি পড়ার পর মনে হয় মানব জীবনের এমন গভীর বিশ্লেষণ গর্কি ছাড়া অন্য কোন লেখকের রচনায় দেখা যায় নি···।" যোশীকে শরৎচন্দ্র গর্কির লেখা গল্প 'ক্রিচারস্ দ্যাট ওয়ান্স ওয়াজ মেন' (গল্পটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে) পড়তে বলেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যোশীকে বলেন, "আপনি এর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন চিন্তা, নতুন স্টাইল এবং নতুন রচনাশৈলী দেখতে পাবেন। মানবতাকে গর্কি এক নতুন বাণী শুনিয়েছেন। যদি তাঁর রচনা না পড়েন তাহলে জীবনের একটা বিশেষ দিকের জ্ঞান-লাভ থেকে আপনি বঞ্চিতই থেকে যাবেন।"

বাংলা ভাষায় গর্কি সম্বন্ধে পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। গর্কির সঙ্গে তাঁর বিদেশে দেখা হয়; সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ত্রয়ী'তে সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন।

'মা'য়ের মরাঠী অনুবাদ 'আই' চল্লিশের যুগের গোড়ায় প্রকাশিত হয়—অনুবাদক শ্রীপ্রভাকর। মরাঠী লেখক বি. ভি. (মামা) ওয়ারের-করের নাটক 'সোনে কে কলস' এবং উপন্যাস 'পুতলিঘরে' গর্কির 'মা'য়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। নাটকটিতে লেখক শ্রেণীসংগ্রামের বিচিত্র রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং উপন্যাসটিতে এঁকেছেন বম্বের কারখানার শ্রমিক-জীবনের চিত্র।

গুজরাতের সর্বস্তরের মানুষের কাছে, এমনকি যারা নিতান্তই উন্নাসিক তাদের কাছেও গর্কি বিশেষ জনপ্রিয়—সমালোচক বটুক দেশাই এক

জায়গায় এই মন্তব্য করেছেন। গুজরাতি ভাষায় 'মা'য়ের অনুবাদ হয়েছে দুটি এবং দুটিরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশের যুগের গোড়ায় যখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব বুদ্ধিজীবীদের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই যুগে গুজরাতের গণ-আন্দোলনের সংগঠকদের হাতে গর্কির 'মা' ছিল অন্যতম হাতিয়ার।

অসমীয়া ভাষায় অনেক লেখক 'মা'য়ের অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। এইসব অনুবাদের অংশবিশেষ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'মা'য়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অসমীয়া অনুবাদ করেন যদুনাথ সইকিয়া। এই অনুবাদটি প্রকাশ করেন আসামের অন্যতম বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা ফণী বরা। উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় ফণী বরা লিখেছেন: "আজ পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই, যে-ভাষায় গর্কির অমর উপন্যাস 'মা'য়ের অনুবাদ না হয়েছে। সারা বিশ্বের সমাজ-বিপ্লবীদের কাছে 'মা' এক অদ্বিতীয় প্রেরণা।"

শ্রীলিঙ্গরাজ কর্তৃক অনূদিত গর্কির 'মা'য়ের (আম্মা) তেলুগু অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে; সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বইটি নিষিদ্ধ করে। সংবাদপত্র ও পাঠকবর্গের আগ্রহ এর ফলে গবর্নমেণ্ট কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। গোপনে গোপনে বইটির প্রচার চলত। মাদ্রাজের প্রথম কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট ১৯৩৯ সালে বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তারপর থেকে বইটির প্রায় ৮টিরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

তামিল ভাষায় 'মা'য়ের অনুবাদ করেন টি. এম. চিদাম্বর রঘুনাথন। বইটির প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল।

উড়িষ্যার বিখ্যাত কবি অনন্ত পট্টনায়ক গর্কির 'মা'য়ের পূর্ণাঙ্গ ওড়িয়া অনুবাদ করেন।

ভারতীয় লেখকদের আলোচনাচক্রে শ্রদ্ধা নিবেদন

ম্যাকসিম গর্কির জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক, সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপকেরা বিশ্বসাহিত্যে গর্কির স্থান ও ভারতীয় লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত লেখক ও সমালোচক এবং ললিত কলা অকাদেমির সভাপতি ড' মুলক্ রাজ আনন্দ। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ (অন্যত্র মুদ্রিত হল) আলোচনার মূল সুরটি বেঁধে দেয়।

সুপরিচিত ঔপন্যাসিক ড' ভবানী ভট্টাচার্য গর্কির কাছে তাঁর 'অসীম কৃতজ্ঞতা' স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "গর্কি ছিলেন গণসাহিত্যের উদ্‌গাতা। বহু ভারতীয় লেখকের কাছেই তিনি পথপ্রদর্শক। যে আবেগবিদ্ধ মানবিকবাদ গর্কিকে তাঁর চরিত্র রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল আমাদের সাহিত্যশৈলীর উপর তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়েছে।"

ড' ভবানী ভট্টাচার্য

আর-একজন লেখক সম্পর্কে লেখকদের এই আলোচনাচক্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে গর্কি তাঁদের হৃদয় ও মনকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মে জুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা।

অনেকেই তাই স্মৃতিচারণে রত হন। ড' ভট্টাচার্যের নিবন্ধেও পুরনো স্মৃতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "তখন সবে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি—আমাদের জেনারেশনের অন্যান্যদের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা ম্যাকসিম গর্কিকে আবিষ্কার করি। তখনই তিনি এদেশকে এবং এদেশের লেখকসমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন—কিন্তু এই নতুন প্রভাবকে আত্মসাৎ করে যে সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সূচনা হয় আরও কিছু পরে। তখন তলস্তয়, চেকভ ও দস্তয়েভস্কির রচনার মধ্যে দিয়ে রুশ সাহিত্য এদেশে সুপরিচিত। এই তিনজন সাহিত্য মহারথীরই মত গর্কি তখন বিশ্ববিশ্রুত কিন্তু তাঁদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির এমন একটি এলাকার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন, তখন যা ছিল প্রায় অনাবিষ্কৃত। তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তার রঙ যাই হোক না কেন, ভারতীয় লেখকেরা অসীম আগ্রহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে গর্কির সাহিত্য পাঠ করেছেন, যদিও তাঁরাও হয়তো বুঝতে পারেন নি গর্কি-যুগের অরুণোদয় আসন্ন।

"গর্কির সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'মা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। পরে গর্কির বিপ্লবোত্তর রচনাবলীও আমি পড়েছি কিন্তু আমার ধারণা, তাঁর সাহিত্য-চিন্তার মূল সত্য বিধৃত আছে 'মা' উপন্যাসেই। বঞ্চিত শ্রেণী এবং তাদের সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রূপায়ণ হিসেবে 'মা'র স্থান এখনও অম্লান···।"

বক্তারা শুধু তাঁদের নিজেদের রচনার উপর গর্কির প্রভাবের কথাই বলেন নি, সমগ্রভাবে ভারতীয় লেখকদের উপর তাঁর প্রভাবেরও আলোচনা করেছেন। ড' মুলক্ রাজ আনন্দ বলেন, "বিগত ৫০ বছরেরও অধিক কাল ধরে অনেক ভারতীয় লেখক গর্কির আদর্শ থেকে অনেকখানি প্রেরণা পেয়েছেন।" অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "গর্কির নাম নিয়েই আমরা লেখকেরা ও পাঠকেরা অনেকে ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করেছিলাম। আমরা যখন সংঘ স্থাপন করি তখন যে-কজন বিশ্ববরেণ্য লেখকের নাম তার পতাকায় উৎকীর্ণ ছিল, গর্কি তার অন্যতম।" গর্কি যখন মারা যান, প্রগতি লেখক সংঘ তখন সারা ভারত জুড়ে গর্কি-দিবস পালনের আহ্বান জানায়। গর্কি-দিবস হয়ে ওঠে এই বিশাল দেশের নানা অংশে সংঘের শাখা স্থাপনের উপলক্ষ। "মধ্য-তিরিশে

অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়

গর্কির নাম তূর্যধ্বনির মত শোনাত আর আমাদের প্রাণে তা জাগাত মহৎ অনুভব।"

তিনি বলেন, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ম্যাকসিম গর্কির উদাত্ত ঘোষণা প্রগতি লেখক সংঘকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এই প্রতিষ্ঠান কিছুকাল ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক সংঘ নামেও পরিচিত হয়েছিল।

"ভারতীয় লেখকেরা উপলব্ধি করেছিলেন, মানবতার যা-কিছু ভালো, যা-কিছু সৃষ্টিশীল তারই নিদারুণ শত্রু ফ্যাশিজম। তখন ফ্যাশিজম ভারতবর্ষেও মাথা চাড়া দিচ্ছে।···ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করার আহ্বান আমাদের লেখকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রধানত গর্কির কাছ থেকেই। গর্কি তাঁর কালে বলতেন, ফ্যাশিস্ত জন্তু এখনও হয়তো দূরে আছে কিন্তু মানবতার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে হলে তাকে ধ্বংস করতে হবে।···ইতিহাস যাঁদের মনে আছে তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে কীভাবে দুধ-কলা দিয়ে ফ্যাশিজমকে পুষেছিল সাম্রাজ্যবাদ, যাতে যথাসময়ে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বের সমাজবাদী অগ্রগতির বিরুদ্ধে লাগান যায়। তখন যেসব ফ্যাশিস্ত ষড়যন্ত্র চলছিল—স্পেনেই হোক আর চেকোশ্লোভাকিয়াতেই হোক কিংবা দূর প্রাচ্যেই হোক—তার পেছনে এই ছিল উদ্দেশ্য। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে অভিযানে রবীন্দ্রনাথের মত আমাদের লেখকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর ফ্যাশিজম বস্তুটি যে কী জাপানী কবি নোগুচিকেও তিনি তা ভালো করেই বুঝিয়ে দেন। এসবের মধ্য দিয়েই ম্যাকসিম গর্কির আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের লেখকদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল···।"

সুখ্যাত হিন্দী কবি ডঃ এইচ. আর. বাচ্চান, এম. পি. বলেন হিন্দী লেখকদের উপর গর্কির প্রভাব সম্পর্কে। "সাহিত্য, জীবন, সমাজবিপ্লব সম্পর্কে গর্কির চিন্তা এতই অনন্য ছিল যে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষ করে সেই সময় যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলাম।

ডঃ এইচ. আর. বাচ্চান

"আমি তখন যুবক। তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগত সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি প্রচার? সাহিত্যের শিল্পমূল্য নিহিত আছে কোথায়? হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন সে যুগটাকে বলা হত ছায়াবাদের যুগ আর সাহিত্যে তখন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন পন্থ, নিরালা ও মহাদেবী। যখন প্রগতি আন্দোলন শুরু হল তখন প্রশ্ন জাগল: সাহিত্য কি প্রোপাগ্যাণ্ডা না কি তার শিল্পমূল্যও কিছু থাকবে? এ নিয়ে রীতিমত একটা বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমরা যখন গর্কির দৃষ্টান্তের দিকে তাকাই তখন সব সংশয় দূর হয়ে যায়। তাঁর সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক—তাতে আছে মহান আদর্শ, নিজস্ব বিশ্বাস, নিজস্ব মান—আবার শিল্পের দাবিকেও তা মিটিয়ে থাকে। গর্কির সাফল্য এইখানেই···।"

হিন্দী সাহিত্যের সুপরিচিত সমালোচক ড' নমবর সিং মুনশী প্রেমচাঁদের উপর গর্কির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। "রুশ ঔপন্যাসিক তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন।" গর্কির মৃত্যু-সংবাদ যখন পৌঁছল, মুনশী প্রেমচাঁদ তখন অসুস্থ। তিনি রোগশয্যা থেকে উঠে গেলেন স্মরণসভায় যোগ দিতে এবং মহান সতীর্থের উদ্দেশে পাঠ করলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। গর্কির মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা তাঁকে দিয়েছিল স্বাতন্ত্র্য। "হিন্দী লেখকদের কাছে গর্কি হলেন রুশ বিপ্লবের

প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্যান্য লেখকদের ব্যক্তিত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল, তিনি ছিলেন এক নতুন সংস্কৃতির, নতুন সমাজের, নতুন পৃথিবীর প্রতিনিধি। গর্কি মানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। গর্কি মানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহিত্য। গর্কি মানে নতুন ধরনের বাস্তববাদ, যাকে বলা হয় সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদ। পৃথিবীতে অনেক মহৎ লেখক আছেন যাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করা যায়। কিন্তু গর্কি তাঁদের চেয়ে

ড· নমবর সিং

স্বতন্ত্র,—তিনি এক নতুন ভাবাদর্শের, নতুন সাহিত্যের, নতুন মানবিকবাদের প্রতিনিধি। গর্কি প্রসঙ্গে মানবিকবাদ কথাটি হামেশাই উচ্চারিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার, তাঁর মানবিকবাদ অন্য ধরনের। গর্কির মধ্যে প্রেমচাঁদ যে-মানবিকতা দেখতে পেয়েছিলেন, তা তলস্তয়ের মানবিকবাদ নয়।"

ড· মহম্মদ হাসান

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের রিডার ড· মহম্মদ হাসান উর্দু লেখকদের উপর গর্কির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "উর্দু লেখকদের কাছে গর্কির কিছু অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে আবদুল হালিম শারারের 'দিলগুদাজ' ও অন্যান্য উর্দু পত্রিকা নানাভাবে উর্দু লেখকদের সঙ্গে গর্কির পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রেমচাঁদ, সুদর্শন, আলি আব্বাস হুসাইনি

প্রমুখের উপর গর্কির প্রভাব তো ছিলই, চল্লিশ ও পঞ্চাশের যুগের কথা-সাহিত্যিকেরাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আর শুধু সাদাৎ হাসান মানতো, ইসমৎ, কৃষণ চন্দর, কে. এ. আব্বাস, সুহাইল আজমাবাদি, হায়াতুল্লা আনসারির নাম উল্লেখেই এই তালিকা শেষ হবে না। আনওয়ার আজিম, শওকত সিদ্দিকি প্রমুখ এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছেন। পরে উর্দু ভাষায় গর্কির তরজমা করেছেন সাদাৎ হোসেন মানতো, লাম আহমদ, সৈয়দ মুত্তলবি ও মখমুর জলন্ধরীর মত বিশিষ্ট লেখকেরা।"

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জাবি বিভাগের প্রধান ড° হরভাজন সিং বলেন, গর্কি পঞ্জাবি লেখকদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং এখনও করেন।

ড° হরভাজন সিং

"গর্কির সৃষ্টিকর্ম কোন বাঁধা ফর্মুলা ধরে অগ্রসর হয় নি, রচনাশৈলীর কোন ধরাবাঁধা নীতিকেও অনুসরণ করে নি। গর্কি অনেক বই হয়তো পড়েছেন কিন্তু তিনি প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন জীবনের কাছ থেকেই, যে-জীবনের স্পন্দন তিনি শিরায় শিরায় অনুভব করেছেন।...এই কারণেই পঞ্জাবি লেখকেরা তাঁর এত ঘনিষ্ঠ।

"গর্কির আর-একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি জনসাধারণের ভাষায় কথা বলেন—এই কারণেও তিনি পঞ্জাবি লেখকদের ঘনিষ্ঠ। গর্কির ভাষা লোকসাহিত্যের ভাষা। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে গর্কি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণের প্রয়াসী। তাই গর্কির সাহিত্যে আমরা দেখি আমাদেরই প্রতিফলন, আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন।"

পঞ্জাবি নাট্যকার শ্রীপরিতোষ গর্গী বলেন, "শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-ভিত্তিক অনেক পঞ্জাবি নাটকেই গর্কির পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।"

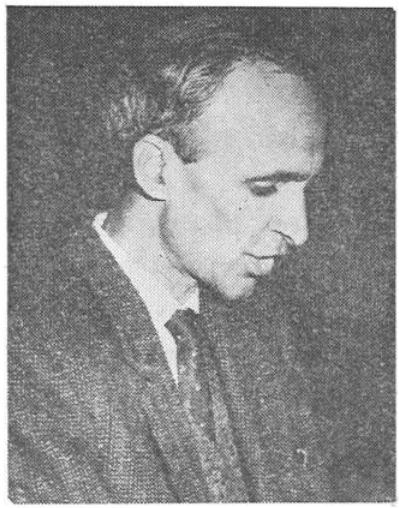

শ্রীপরিতোষ গগর্গী

গর্কির নাটকের নায়ক সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শ্রীগর্গী পঞ্জাবি ভাষায় তাঁর নাটক 'তদকসার-দ নেহ্‌রা' রচনা করেছেন। "তাঁর অসাধারণ চরিত্রবোধ, আশ্চর্য সংলাপ, তাঁর আন্তরিকতা, নৈতিক একনিষ্ঠতা এবং চিত্তের ভয়শূন্যতা শিল্পী হিসেবে তাঁকে দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা।"

বাঙলা সাহিত্যের উপর গর্কির প্রভাব বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে গর্কির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল বাঙালি লেখক বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁদের বলা যায়, প্রগতি লেখক আন্দোলনের পূর্বসূরী। বাঙলা ভাষায় গর্কির রচনার প্রথম তরজমাকার শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে আবেগকম্পিত কণ্ঠে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেন, চ্যাপম্যান কৃত হোমরের অনুবাদ পাঠ করে কীটস যেমন বিচলিত হয়েছিলেন প্রায় তেমনি বিচলিত হয়েছিলেন পবিত্রবাবু গর্কির রচনা পাঠ করে। পবিত্রবাবুর বয়স এখন সত্তরের কোঠায়। এখনও তিনি গর্কির অনুরাগী।

ডঃ মুলক্ রাজ আনন্দ বলেন, গর্কি সাহিত্যে আনেন মানুষ সম্পর্কে, কী করে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে এক নতুন ধারণা। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, পদদলিত, অসম্ভ্রান্ত মানুষকে বিশ্বসাহিত্যে প্রথম স্থান করে দেন তিনিই। তিনি প্রবর্তন করেন সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের সাহিত্য। জোলার মত মানুষের অবস্থা বিবৃত করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, মানুষের অবস্থা কত শোচনীয় এইটে দেখাবার জন্যেই তিনি কলম ধরেন না, মানুষ কী হতে পারে তারও ইঙ্গিত তিনি দেন। আর আমরা চোখের সামনে দেখেছি

মানুষ বদলেছে, পুরনো দিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন রুশিয়ার স্থলে জন্ম হয়েছে এক নতুন রুশিয়ার। স্বভাবতই ত্রিশের যুগে সমাজ-পরিবর্তনের প্রেরণা লেখকেরা পেয়েছেন গর্কির কাছ থেকে।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গর্কি মনে করতেন লেখা একটা বৃত্তি। লেখক গজমোতি মিনারের বাসিন্দা নন। জীবনপ্রবাহের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকেন। তিনি মনে করতেন, লেখকদের একযোগে এমনভাবে এই বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত যাতে নতুন মানুষের অভ্যুদয়ের পথ সুগম হয়।

ড° ভবানী ভট্টাচার্য বলেন, "যে-দেশ বিশ্বসভায় একদা ছিল অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য জোয়াল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে-দেশ সংগ্রাম করছিল সে দেশের লেখকদের উপর গর্কির প্রভাব পড়বে তা অনিবার্য আর সে প্রভাব কী ধরনের হবে তা-ও পরিষ্কার। কিন্তু গর্কির মধ্যে আরও এমন কিছু ছিল যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সভ্য অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত, অনশনক্লিষ্ট কৃষকসমাজ সম্পর্কে অবহিত হতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। আমাদের অনেক লেখকের মনেই সেই অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে, 'মা' উপন্যাসে যা আবেগবিদ্ধ নাটকীয়তা লাভ করেছে। ইতিহাসের কালবিচারে নিমেষের মধ্যেই গণ-আন্দোলনের ব্যাপক ধারা উত্তাল হয়ে উঠল। বারুদের স্তূপ জমা হয়েইছিল, প্রয়োজন ছিল শুধু দু'একটি স্ফুলিঙ্গের। আমাদের সৃষ্টিশীল লেখকেরা দু'একটি স্ফুলিঙ্গ জেলেছেনও।"

ড° নমবর সিং বলেন, সাহিত্যে ফিলিস্টিনিজমের বিরুদ্ধে ছিলেন গর্কি। তিনি শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মহত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তোলেন। তিনি বলতেন, সাধারণ মানুষ মহৎ গ্রন্থের চেয়েও বড়।

ড° মহম্মদ হাসান বলেন, মানব-অভিজ্ঞতায় একটি নতুন স্তর সংযোজন করেছেন গর্কি। "গর্কি শুধু একটা নাম নয়, গর্কি শুধু একজন লেখক নন, শুধু একজন সেরা গল্প-বলিয়ে নন—তিনি নতুন চেতনারও প্রতীক, নতুন সংবেদনার মশালবাহী।" শিল্পে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন তিনি। তিনি দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে বেঁচেছিলেন এবং মানব পূর্তির প্রয়াসকে চিত্রিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভবিষ্যৎ শ্রমজীবী মানুষদেরই করায়ত্ত। তিনি সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছেন। জন-

সাধারণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁর বাস্তববাদের উৎস। তিনি নিজে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করেছেন। এদিক দিয়ে মুনশী প্রেমচাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। "সর্বোপরি, গর্কির ঐতিহ্য হল তাঁর বিদ্রোহী মনোভঙ্গী। তিনি গেয়েছেন সমাজ-পরিবর্তনের গান, বিপ্লবের গান, মানবমুক্তির গান এবং এই আদর্শের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে সেকেলে ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসকে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছেন। আজ তাই গর্কির অনুরাগীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার গর্কিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাঁর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, তার জন্যে প্রয়োজন আজ নতুন করে সমাজ-পরিবর্তনের আদর্শের জন্যে, বিপ্লবের জন্যে, মানবমুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করা এবং আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে বিদ্রোহী মনোভাব অনুশীলন করা।"

ড· নিনা দাদোনোভা

মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও নয়া দিল্লির ইনস্টিটিউট অব রাশ্যান স্টাডিজের ভিজিটিং প্রফেসর ড· নিনা দাদোনোভা গর্কির ৯০র যুগের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই যুগে গর্কি তাঁর কাহিনীর নায়করূপে চিত্রিত করেন সেইসব যোদ্ধাদের জনসাধারণের সুখের জন্যে যারা সংগ্রাম করছে এবং সব ধরনের দাসত্বকে যারা ঘৃণা করে। নব্বুয়ের যুগেই তিনি দেখান, একটা নতুন শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েত অচিরেই সামাজিক সংগ্রামে যোগ দেবে। "লেখকরূপে আবির্ভূত হয়েই গর্কি রুশ সাহিত্যে এক নতুন যুগের উদ্বোধন করেন।"

ড° মুলক্ রাজ আনন্দের ভাষণ

বন্ধুগণ,

ম্যাকসিম গর্কির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই সমাবেশের আয়োজন সম্ভব হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। আমি বর্তমানে সমকালীন আন্তর্জাতিক শিল্প-কলার ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য শিল্পসামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছি। অন্য অনেকের চাইতে বেশি কথা লিখেও আমি নিজের লেখা যাবতীয় কথা ভুলে যেতে বসেছি। গত কয়েক মাসে আমি প্রায় শব্দের মানেই ভুলে গেছি।

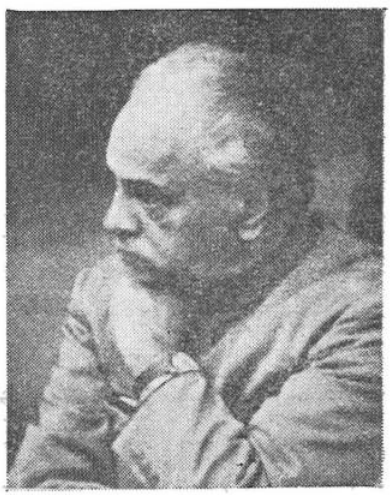

ড° মুলক্ রাজ আনন্দ

আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি আমার অন্য কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি, কারণ এখানে আসবার একটা তাগিদ অনুভব করেছিলাম। এখানে এসে এই আলোচনাসভায় আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে না পারলে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখিত হতাম। তার কারণ যেমন ব্যক্তিগত, তেমনিই নৈর্ব্যক্তিক। আমার রচনায় আমি ম্যাকসিম গর্কির কাছে অনেকাংশে ঋণী। ভারতের লেখক-সমাজের মধ্যে যাঁরা আমাদের বন্ধুস্থানীয়, তাঁদের অনেকের পক্ষ থেকেই আপনাদের জানাতে পারি যে, আমাদের মধ্যে যাঁরাই পঞ্চাশোর্ধ্বে, তাঁরাই ম্যাকসিম গর্কির কাছে গভীরভাবে ঋণী। শুধু এই একটিমাত্র কারণ বর্তমান থাকলেও তাঁকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি নিজে এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবিসমাজে আমার সহযোগীরা

ম্যাকসিম গর্কির কাছে যা পেয়েছি, তারই দু'একটি বিষয় আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

প্রথমেই মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা যখন আমরা পরাধীন ছিলাম। তখনই গর্কির 'মা' পড়ে আমরা মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলাম। পঞ্জাবে আমার এগারো দিনের কারাবাসকালে আমি গভীর রাত্রে গর্কির লেখা পড়তাম। দিনের বেলায় পড়া চলত না। আপনাদের মধ্যে যাঁদের বয়স কম, তাঁরা জানেন না যে, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আদেশে ভারতে ম্যাকসিম গর্কির রচনাবলী নিষিদ্ধ ছিল। তখন গর্কির লেখা পড়লে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হত। তার পরিণতি কী হত, আপনারা তা শুনেছেন। ঐ ধরনের আবহাওয়া থেকেই অবশ্য গর্কির মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে কী ধরনের চেতনা সক্রিয় তা জানবার প্রগাঢ় কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। এই চেতনাই আমাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করেছিল। আমরা তাঁর কাছেই সত্যনিষ্ঠ হতে শিখেছিলাম। কারণ তিনিই প্রথম লেখক যিনি রুশ সাহিত্যে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বসাহিত্যে রুশিয়ার অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অপরিচিত, ব্রাত্য, সমাজের কর্তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, সাহিত্যে স্থান পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত জনমণ্ডলীকে নায়কের সম্মানে আসীন করেছিলেন। তাঁর আগেই অবশ্য তলস্তয় "হাজি মুরাদ" ও "সেবাস্তোপোল-কাহিনী" এবং কয়েকটি ছোট গল্পে সাধারণ মানুষের কথা লিখেছেন, আমাদের কালের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির এশীয় অধিবাসীদের কথা লিখেছেন। আর কেউ এই প্রত্যাখ্যাত মানুষের কথা লেখেন নি। দস্তয়েভস্কি লিখেছিলেন "অপমানিত ও লাঞ্ছিত"—কিন্তু সে-তো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার মনে হয়, "মকর চুদ্রা" থেকেই গর্কি সাহিত্যে এই ব্রাত্যদের প্রতিষ্ঠা করলেন। 'মানুষ কীভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করে', এই প্রশ্নই তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, যে-মানুষ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ নয়, সে মানুষও সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। এই ধারণাটিই তখন নতুন। আমার মনে আছে, ১৯২৮ সালে লণ্ডনে আমি শ্রীমতী কন্‌স্টান্‌স্ গারনেটের অনুবাদে ডাকওয়র্থ প্রকাশিত গর্কির "ছাব্বিশটি পুরুষ ও একটি মেয়ে" এবং আরো কয়েকটি গল্প পড়েছিলাম। এই সংস্করণে এডওয়র্ড গারনেটের একটি ভূমিকা ছিল। উদারতন্ত্রী গারনেট একটি দামী কথা বলেছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন, ইংরেজরা সাহিত্যে নোংরা কিছু দেখতে চায় না, কুৎসিত মানুষ দেখতে চায় না ; সুদূর স্তেপভূমির এইসব মানুষ, ইউরেশিয়ার এইসব মানুষকে দেখতে চায় না।

এর থেকেই আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারবেন আমি কেন গর্কিকে ব্রাত্যদের লেখক বলে মনে করি, শুধু ইউরেশিয়ার ব্রাত্যদেরই নয়, সমগ্র এশিয়ারও ; এইভাবেই তিনি আমাদের গুরু হয়ে ওঠেন। গর্কির রচনা প্রকাশিত হবার পর, এডওয়র্ড গারনেট জীবনের নোংরামি ও কদর্যতা সম্পর্কে লিখবার অভিযোগে তাঁকে দায়ী করার পর, পশ্চিমে, এশিয়ায়, আফ্রিকায় ত্রিশের যুগের আন্দোলনের স্রোত বয়ে গেছে। মালরো, চেলিনি, হেমিংওয়ে, ফকনর, রাল্‌ফ ফক্‌স্, জ্যাক লিণ্ডসে, মাও তুন, শোলোখভ এবং অন্যান্য লেখকেরা তখন লিখছেন। গর্কি যে-পথ উন্মুক্ত করে দেন, তারই ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। গর্কি ছিলেন এক নতুন সাহিত্যের ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষি।

গর্কি সাহিত্যে শুধু এই নব মানবিকবাদই আনেন নি ; আমার মতে, তিনি এনেছেন সাহিত্য সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা। তলস্তয় ছাড়া অন্যদের রচনায় সাহিত্য তখনও ছিল মোটামুটিভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডের বিবরণ ; একমাত্র তলস্তয়েই ছিল মানবিক মূল্যবোধের গভীরতা। পশ্চিমেও দেখা যেত, লেখকেরা মানুষের অবস্থার বিবরণ দিচ্ছেন মাত্র। এই চরিত্র-সমূহের কাছে লেখক কী দাবি করেন, তার কোন নির্দেশ থাকে না। গর্কির আগে বৈপ্লবিক রোম্যাণ্টিকবাদের প্রত্যাশার ছবি সাহিত্যে আসে নি। আমার মতে, পুঁজিবাদী দুনিয়া যাকে সাধারণত প্রচার বলে চিহ্নিত করে, গর্কিই তা প্রথম সাহস করে সাহিত্যে স্থান দিলেন। সব শিল্প-কীর্তিই প্রচার। অজন্তার শিল্পকলা বৌদ্ধধর্মের পক্ষে প্রচার। ইলোরার শিল্পকলা হিন্দুধর্মের সপক্ষে প্রচার। পশ্চিমী উপন্যাস বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে মানবিকবোধের সপক্ষে প্রচার। মানবিকবাদী গর্কি শুধু মানুষের কথা বলে, মানুষের অবস্থা চিত্রিত করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, মানুষের অবস্থা কী ভয়াবহ, তা-ই বলে ক্ষান্ত থাকেন নি ; মানুষ কী হতে পারে, তা-ও তিনি নির্দেশ করেছেন। এইভাবেই তিনি মানুষের সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়েছেন।

ছোট গল্প থেকে শুরু করে 'ক্লিম সামগিন' পর্যন্ত গর্কির রচনার মধ্যে

এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, মানুষ নিজেকে বদলাতে পারে। এই ধারণা রুশ সাহিত্যে তখন অভিনব। এমনকি তলস্তয়ও এ-ধরনের কোন ধারণা তুলে ধরেন নি। গর্কিতেই এক যুগের সূত্রপাত হল। লেখক এখন থেকে, মানুষ কী হতে পারে, সেই অভিষ্ট কল্পনা করতে পারবেন। রুশ বিপ্লবের আগে বুদ্ধিজীবিসমাজ বিশ্বাস রেখেছিলেন এরই উপর। এই সময়ের অনেক লেখকের রচনাতেই, মানুষ নিজেকে বদলাতে পারে, এই বিশ্বাসের প্রভাব পড়েছিল। একথাও হয়ত বলা যায়, মানুষ নিজেকে বদলাতে পারে, এই ধারণা প্রবর্তন করে গর্কি সমাজ-পরিবর্তনের অনুকূল আবহাওয়া রচনা করেছিলেন বলেই রুশ বিপ্লব তরুণ সমাজের চেতনাকে অনুপ্রেরিত করতে পেরেছিল, মানুষকে বদলাবার প্রয়াসে তাদের উদ্দীপ্ত করেছিল। আগের অবদানের চেয়েও গর্কির এই অবদান আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর থেকেই দুর্বল নিপীড়িত মানুষ এই ভরসা লাভ করেছিল যে, বিপ্লব মানুষকে বদলে দিতে পারে।

আমরা বলতে পারি, গর্কি যেন বিপ্লবেরই ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন।

এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান গর্কির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। গর্কির ব্যক্তিত্বের প্রভাব পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে কতটা গভীর ছিল, আমি তার সাক্ষ্য দিতে পারি। রোমাঁ রোলাঁ থেকে শুরু করে বারবুস ও ত্রিশের যুগের লেখকেরা সকলেই স্বীকার করেছেন, সমাজকে বদলাবার তাগিদ তাঁদের মধ্যে এসেছিল রুশিয়ার বিপ্লবের এই ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার কাছ থেকেই। আমি জানি না আপনারা গর্কির লেখা তলস্তয়, চেহভ ও অন্যান্যদের 'স্মৃতিকথা' পড়েছেন কিনা। গর্কি সম্পর্কে লেনিনের প্রবন্ধ আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না। এই লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পেলে আপনারা দেখবেন, লেনিন গর্কিকে আন্দোলনের সহকর্মী বলে মেনেছিলেন—এমন একজন সহকর্মী যিনি লেখকের স্বকীয় ও অনন্য ভঙ্গিতে রুশিয়ায় বিপ্লবের অনিবার্যতার চেতনা সঞ্চারিত করেছিলেন। আমার এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই।

আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি, আমার ভারতীয় তরুণ বন্ধুরা আজকাল আর তেমন গর্কি পড়েন না। তাঁরা হয়ত তার বদলে সার্ত্রে পড়ছেন। সমান ভালো লেখা। এতে কোন ক্ষতি নেই। সার্ত্রে দাঁড়িয়েছেন মানবিক

মর্যাদার সপক্ষে। তবুও আমার দুঃখ হয়, আমাদের তরুণ লেখকেরা অনেকেই গর্কি পড়েন নি। তাঁরা তলস্তয়ও পড়েন না। আমার মনে হয়, তাঁরা পড়েনই কম। আমি তাতে বিস্মিত হই না, কারণ তাঁরা শারীর তাগিদের সমাজে বেঁচে থাকার জটিলতর প্রয়াসে নিয়োজিত। এ এক ভয়ংকর পরিস্থিতি, জটিল পরিস্থিতি। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যত লেখককে আমি জানি, তাঁরা সকলেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট এক সমাজে বেঁচে থাকবার প্রাণান্ত চেষ্টায় নিরত। বিশ্বের বুদ্ধিজীবিসমাজ যে এই সংকটেই ভাবিত হয়ে থাকবেন, এ তো স্বাভাবিকই। তবুও আমার মনে হয়, আজকের লেখকদের সামনে সমকালীন চেতনাকে অতীতের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার গুরুত্ব থেকেই যায়।

এমনও হতে পারে যে, নতুন লেখার প্রেরণা সব সময় বর্তমান থেকে উৎসারিত হয় না। আমি যদি কোন নতুন উপন্যাস লিখতে চাই, আমি হয়ত শুরু করব গর্কির মানবিকবাদ থেকেই। এ মানবিকবাদ সেকেলে নয়, কারণ মানবিকবাদ কখনই সেকেলে হতে পারে না। মানুষের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কখনই সেকেলে হতে পারে না।

গর্কি আমাদের কালের মহান প্রেরণাদাতা। তিনি আমাদের সমাজের পক্ষে অপরিহার্য, বিশেষত এই কারণে যে আমরা এখনও মানবসমাজের সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারি নি। আমরা হয়ত কেবল সমস্যাগুলিই উপলব্ধি করেছি মাত্র। আমার বিশ্বাস, আমার কোন নির্দেশ জারি করার প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নতুন লেখকেরা যদি ভাষা আর টাকাকড়ি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত না হন, আমরা তবে আরো তীব্রভাবে পড়বার, লিখবার, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠবার তাগিদ অনুভব করব। আমরা কি সত্যিই সোভিয়েত জনগণের ৫০ বছরের কীর্তির মত এশিয়ায় এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস করি, না, আসলে বিশ্বাস রাখি না? গতকাল প্রাক্তন কমিউনিস্ট একজন লেখক আমায় বললেন, তিনি আর ইতিহাসে বিশ্বাস করেন না। তিনি তাঁর জৈব অস্তিত্বটাই অস্বীকার করতে চান। এমনি আরো অনেক লেখক ইতিহাসকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকতে চান। আমি এই লেখকদের উপর দোষারোপ করছি না। যা কিছু কুৎসিত তা থেকে পালানোর দাম আছে। অনেক মানুষই প্রতিদিনকার জীবনের সংগ্রাম, মানুষকে মনুষ্যত্বে

সঞ্জীবিত করার সংগ্রাম সহ্য করতে পারেন না। অথচ এ সংগ্রাম তো অনিবার্য। তবুও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজেদের জৈব অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে শূন্যতার মধ্যে বাস করার সাধ দেখে আমার দুঃখ হয়।

গর্কি বলেছিলেন, "সাহিত্য পৃথিবীর হৃদয়।" আমি বলব, লেখক সেই হৃদয়ের হৃৎস্পন্দন। প্রাণবান হৃদয় ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব নেই।

ভারতের তরুণ লেখকদের কাছে আমি গর্কি-কথিত এই সত্যটি তুলে ধরছি।

কলকাতায় গর্কি জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

অসংখ্য সভা, প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলকাতা মহানগরী ম্যাক্সিম গর্কির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। সর্বত্র এইসব সভা ও আলোচনাচক্রে আর প্রদর্শনীতে অসংখ্য শ্রোতা ও দর্শক সমাগম বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মানবতাবাদী বিশ্ববিখ্যাত এই সাহিত্যিকের সৃষ্টির প্রভাব আজও মানুষের মনকে কী গভীর আবেদনে স্পর্শকাতর করে রেখেছে।

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ভাষণদানকালে সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রুশ সাহিত্য এবং বিশেষ করে গর্কির প্রতি আমাদের ঋণ স্বীকারের জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান।" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে গর্কি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন রাজপাল ধর্মবীর। পাশে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত জাতিসংঘের কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেল ভি. এ. ঝারকোভ

বলেন, তাঁর জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'র মতই অন্যতম প্রিয় উপন্যাস গর্কির 'মা'। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালে গর্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দেন।

তিনদিন ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্র দেখতে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

গর্কি জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের স্মারক ডাকটিকিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় ২৮ মার্চ, কলকাতার জি. পি. ও-তে। সোভিয়েত জাতি-

জাতীয় গ্রন্থাগারে গর্কির পুস্তক ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনী

সংঘের কনসাল জেনারেল মি. ভি. এ. ঝারকোভের হাতে উপহার দিয়ে পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রীএ. এন. বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে গর্কির জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণদান প্রসঙ্গে রাজ্যপাল ম্যাকসিম গর্কির জীবনদর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে ভারত তার স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গর্কির সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। সোভিয়েত জাতিসংঘের কনসাল

জেনারেল মি. ঝারকোভ রাজ্যপালকে এই উপলক্ষে গর্কির রচনাবলী উপহার দেন। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গর্কির দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার কথা স্মরণ করেন।

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির আহ্বানে গর্কি জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, "আমরা বাংলাদেশের লেখকেরা নিঃসন্দেহে চেকভ, দস্তয়েভস্কি, গোগলের ও অন্যান্য রুশ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছি, তবু আমাদের হৃদয়ে গর্কির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। যৌবনে আমি গর্কির আত্মজীবনীমূলক রচনা পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এমনভাবে গর্কি মানুষের চরিত্রচিত্রণ করেছেন, যা কল্পনাতীত। অনেক সাহিত্যিকই নিঃস্ব মানুষের কথা লিখেছেন, কিন্তু গর্কি নিপীড়িত মানুষের একজন হয়ে তাদের কথা লিখেছেন। শুধু রুশ সাহিত্যে নয়, গর্কির অবদান সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে।" ভাষণ সমাপ্ত করে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র গর্কির উদ্দেশে লেখা স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মানুষ অজেয় এই ছিল গর্কির বাণী। বাংলাদেশে এমন একজন লেখক অথবা ছাত্র নেই যিনি গর্কির কোন বই না পড়েছেন। গর্কির 'মা' একটা যুগে সকলকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।" গর্কির সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশের ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে গর্কিই ছিলেন সাহিত্যে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রবর্তক। গর্কি সারা রুশিয়াকে ও তার বিভিন্ন অধিজাতির মানুষকে জানতেন। এদের সত্যনিষ্ঠ ছবি তিনি এঁকেছেন পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনে তিক্ততার মধ্যে ডুবে গিয়েও, চরম দুর্দিনের সামনে দাঁড়িয়েও গর্কির সৃষ্ট মানুষ পরাজয় স্বীকার করে না গর্কির সাহিত্যসৃষ্টির সবচেয়ে উজ্জ্বলতা এইখানেই।

সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে স্টুডেন্টস হলে আহূত গর্কি জন্মশতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। সভায় অন্যতম বক্তা শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশ তাঁর ভাষণে বলেন যে, যে-শক্তি ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই শ্রমজীবী মানুষের উপর গর্কির ছিল অগাধ বিশ্বাস। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, গর্কির মানবতাবাদের ভিত্তি ছিল

পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের উপর তাঁর গভীর প্রত্যয়ে। সাহিত্যে অবক্ষয় ও ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধে গর্কির সংগ্রামের উল্লেখ করে শ্রীসুধী প্রধান বলেন, বর্তমানে তরুণ বাঙালি সাহিত্যিকের কাছে গর্কি উদাহরণ হয়ে থাকবেন। অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও ড° অরবিন্দ পোদ্দারও সভায় ভাষণ দেন। কয়েকজন বিশিষ্ট কবি সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

কলকাতার 'রাইটার্স গিল্ড' আয়োজিত শ্রী শিক্ষায়তন হলে গর্কি জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে বিচারপতি শ্রীমাসুদ বলেন, মহান গর্কি ছিলেন নিপীড়িত মানুষের পক্ষে;তিনি আমাদের নিপীড়িত মানুষের জীবনের বেদনা সম্পর্কে সচেতন করেছেন, আমাদের সাহসী হতে প্রেরণা

গর্কি স্মারক ডাকটিকিট কিনছেন সোভিয়েত কনসাল
জেনারেল ভি. এ. ঝারকোভ

দিয়েছেন। তাই গর্কির প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদন।" অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। সভায় শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, গর্কি বুঝেছিলেন মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা; এই বোধ তাঁকে পেটিবুর্জোয়া ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বক্তৃতার পর বলাকা মহিলা সংঘ বাংলায় গর্কির 'মা' মঞ্চস্থ করেন।

২৯ মার্চ জাতীয় গ্রন্থাগারে রাজ্যপাল ধর্মবীর গর্কির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বই ও ছবির একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন যে বর্তমান বিশ্বের সমস্যা অনেক। ভাল বই এবং ম্যাকসিম গর্কির মত সাহিত্যিকের বই পৃথিবী ও মানুষের মঙ্গলের পথ দেখতে পারে।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমান যুগের মহান চিন্তানায়করূপে ম্যাকসিম গর্কি সারা বিশ্বে সুপরিচিত। তাঁর সাহিত্য মানুষকে তার সহযাত্রী মানুষের সঙ্গে পরিচিত করেছে। জীবনের তিক্ততার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে গর্কি জীবনকে তিক্ততা-মুক্ত করার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

"আমাদের বাংলা ও হিন্দি প্রগতি সাহিত্যের লেখকেরা বিপুল আগ্রহে গর্কির রচনা পাঠ করেছেন। এই শতকের বিশের যুগের 'কল্লোল' ও 'কালি কলমের' লেখকবৃন্দ একদা-নিপীড়িত শ্রমজীবনের আলেখ্য রচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে প্রেমচাঁদ যে-ভাষণ পাঠ করেন তার ছত্রে ছত্রে ছিল গর্কির প্রভাব। প্রায় একই সময়ে বিখ্যাত কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩৭ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় গর্কি সম্বন্ধে এক সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন।

"ভারতের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গর্কির আগ্রহ ছিল অদম্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী গর্কি সযত্ন অনুধাবনের চেষ্টা করে এসেছেন দীর্ঘকাল।

"সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে একত্রে ভারতও এই মহান সাহিত্যিক, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও মানবতাবাদী মহান লেখকের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।"

৩০ মার্চ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সাহিত্য-সমালোচক শ্রীগোপাল হালদার গর্কির মানবতা-বাদ প্রসঙ্গে বলেন: "নিজের জীবনের কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা গর্কির মানবতাবাদকে গড়তে সাহায্য করেছে। রুশ সমাজজীবনের অতল অন্ধকার থেকে, প্রকৃতই 'নিচের মহল' থেকে উঠে এসেছিলেন গর্কি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস তিনি কোনদিনই হারান নি। তিনি মনে করতেন অমঙ্গলের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হবে—আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। গর্কি ছিলেন রুশ দেশ ও বাকি পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধের মত।"

শ্রীতারলোক সিং রুশ ভাষায় গর্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীপ্রদীপ বসু রুশ ভাষায় গর্কির রচনা থেকে পাঠ করেন। শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গান রুশ ভাষায় গেয়ে শোনান।

সভাপতি শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য এম. এল. সি বক্তাদের ও সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।